মানুষের মাংসের রেস্তোরাঁ

মোজাফ্‌ফর হোসেন

সূচিপত্র

একটি খুনের স্বীকারোক্তি	৯
শেষ মাথাটি কাটাপড়ার আগে	১৩
স্পাই	২০
মানুষের মাংসের রেস্তোরাঁ	২৬
জীবনের গল্প প্রতিযোগিতা	৩৩
বঙ্গবন্ধুকে চিঠি	৪২
যে জীবন ফুটবলের	৪৯
খুনের সংবাদ ধরাতে	৫৪
ধর্ষণের প্রতিশোধ	৬১
মিসিং পিৎজা বয়	৬৫
বাক-স্বাধীনতার এক চরম দৃষ্টান্ত	৭১
পুনরুত্থান	৭৬
করোনা, মৃত্যুর আগে ও পরে	৮১
মেন্টাল	৮৮
বেকারজীবনের অপঠিত গল্পটা	৯১
ফের প্রতিযোগিতায় খরগোশ-কচ্ছপ	১০১
সিসিফাস হাসে ঈশ্বরের হাসি	১০৫
বিড়াল পোস্টমর্টেম	১০৮
গল্প না বা নিছক কল্পনা	১১২
যেভাবে লেখা হলো কবি বাবু মণ্ডলের জীবনবৃত্তান্ত	১১৮
মসজিদ	১২৩

একটি খুনের স্বীকারোক্তি

খুন করেছিস কেন? খগেনকে জিজ্ঞাসা করেন থানার দারোগা। খগেন চুপ করে শোনে। জবাব দেয় না। হাবিব চেয়ারম্যানকে হত্যার মামলায় ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলার বিবরণ মোতাবেক, খুনি রাতের অন্ধকারে হাবিব চেয়ারম্যানের বাড়িতে ঢুকে ঘুমন্ত চেয়ারম্যানকে প্রথমে চেতনানাশক কিছু শুঁকিয়ে অজ্ঞান করেছে, এরপর তার হাত দুটো খাটের সঙ্গে বেঁধে ধারালো বঁটি দিয়ে গলাটা কেটেছে। বঁটিটা পাওয়া যায়নি, কিন্তু বাদীপক্ষ কেসের বিবরণে এমনটি বলেছে। বাদী চেয়ারম্যানের দুই ছেলে।

খগেনের বাড়ি চেয়ারম্যানবাড়ির ডান পাশের প্রাচীরের ওপাশে। প্রাচীরটা হাত-পা ছড়াতে ছড়াতে খগেনের উঠোনের প্রায় সবটুকু খেয়ে ফেলেছে। আর একবার ধাক্কা দিলেই ওর মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পগারে গিয়ে পড়বে। একসময় চেয়ারম্যানবাড়ির জমিটুকুসহ এখানে অনেকটা জায়গা খগেনদের ছিল। বেশি দিন আগের কথা না, এই ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে। খগেনের দূরের স্মৃতিতে কিছু কিছু দৃশ্য এখনো টিকে আছে। সে নিয়ম করে কৃষাণের হেঁসু ধার দেওয়ার মতো করে এই সামান্য স্মৃতিটুকু শান দিয়ে রাখে।

খগেনের কাজ ছিল রোজ ঘুম থেকে উঠে চেয়ারম্যানকে একচোট গালিগালাজ করে নেওয়া। এরপর বগলে লাঠি আর কাঁধে ঝোলাটা গুঁজে বের হয়ে যায়। সন্ধ্যায় যখন ফেরে, তখন আর গালাগালি করে না। হারিয়ে যাওয়া সংসার, জন্ম না-নেওয়া সন্তানের কথা মনে করে কাঁদে। অনেক রাত পর্যন্ত ওর ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসে। কিন্তু সকাল হলেই খগেন ফের বদলে যায়। যা-তা বলে চেয়ারম্যানকে গালি দেয়। এর মধ্য

অনেকবার সে খুন করার ইচ্ছাও প্রকাশ করে। যে রাতে খুন হলো, সেদিনও বলে গেছে, 'আজ তোকে না মেরি আমি রাইত পার করবু না।' এ কথা পাড়ার আরও পাঁচটা লোক শুনেছে। তাই ভোরে যখন একা ঘরে এই সাবেক চেয়ারম্যানের লাশটা পাওয়া গেল, গলাকাটা অবস্থায়, কেউই আর দ্বিধায় থাকেনি যে খুনটা খগেনই করেছে। ওকে আসামি করার বিষয়ে চেয়ারম্যানের ছেলেদের একবারও ভাবতে হয়নি; বরঞ্চ সুবিধাই হয়েছে। খগেন নিজেও এর প্রতিবাদ করেনি। পুলিশ যখন এসে বলল, 'তুই খগেন?' তখন খগেনকে দেখে পুলিশের বুঝতে অসুবিধা হলেও সে দিব্যি পুলিশের সামনে গিয়ে বলল, 'আমাকে তো বাঁধতি পারবেন না। গাড়িতে উঠি দেন। আমি পালাবু না।' তখন আর তারা কোনো কথা না বাড়িয়ে খগেনকে ধরে নিয়ে গেল।

খগেন জানে, চল্লিশ বছর ধরে একটা খুন সে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছে। এমনকি কত স্বপ্নে খুনটা সে করেও ফেলেছে। সকালে উঠেই নিজের অক্ষমতার জন্য আফসোস হয়েছে। কিন্তু আজ যখন সত্যি সত্যি জানতে পারল চেয়ারম্যান খুন হয়েছে, একবারও মনে হয়নি খুনটা সে করেনি। কিন্তু সে মনে করতে পারছে না খুনটা সে কীভাবে করেছে। তাই দারোগা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা তোর কাজ?'

'জে, হতি পারে।' সে সরাসরি উত্তরটা দিতে পারে না।

'হতে পারে মানে? কোনো সন্দেহ আছে?'

'আমারই মেরি ফেলার কতা। ক্যান্ত আমার কিছু মনে পড়চি না। রাতি একবার বাজ্জি পেয়ি ঘরের বাইরি গি দ্যাকলাম ঘোর নিশি। চিয়ারমেনের দু পক্ষির দুই ছেলির মদ্যি ত্যাকুন জমিজমার ভাগাভাগি নি বিবাদ চলচি। বাজ্জি না সেরি ঘরে আলাম। গা-জুড়ানো বাসাত হচ্ছিল, তাই ঠিকমতন চোখ বন্ধ করার টাইম পালাম না, আরামে তার আগেই ঘুম চলি আসলু। ঘুম ভাঙলু এক্কেবারে বিহানে, চেয়ারম্যান বাড়ির হইচইয়ে। মদ্যি রাতি কী হয়ছে আমার কিচ্ছু মনে নেই, স্যার।'

'মনে করার চেষ্টা কর। রাতে ফের পায়খানার বেগ উঠল। তুই বদনাটা নিয়ে বাইরে গেলি।'

'হতি পারে। কেননা, সকালে উঠি দ্যাখলাম প্যাট একদম খালি। এরপর কি করলাম স্যার?' খগেন জানতে চায়।

'পায়খানা সেরে ঘরে গেলি। হাতের কাছে বঁটিটা ছিল, তুলে নিলি।' দারোগা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

'জে, মনে পড়ছে। তেবে আমার ঘরে বঁটি নেই, হেঁসু হতি পারে।

'বিবরণে যেহেতু বঁটির উল্লেখ আছে, তুই বঁটির কথা বল। খুন যখন করেছিস, তখন বঁটি আর হেঁসুতে কী এসে যায়! শাস্তি যা হওয়ার তা তো হবেই।'

'জে, বঁটিই ভালো। এমনিতেও আসচি হাটে একটা বঁটি কিনতাম। হেঁসুতে তরকারি কাটতি কষ্ট হয়।'

'এরপর তুই বঁটিটা নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলি। মনে পড়ে?'

'জে, এ রকম একটা খোয়াব আমি দেখছিলাম।'

'তুই চেয়ারম্যানের ঘরের ভেতর ঢুকে তার নাকে ক্লোরোফর্ম মাখানো রুমাল ধরে অজ্ঞান করে নিলি। নিলি তো?'

'জে, নিলাম।' বলে খগেন একটু থেমে জিজ্ঞাসা করে, 'ক্লোরোফর্ম কী, স্যার?'

'অজ্ঞান করতে গেলে লাগে।' এর বেশি তোকে বুঝতে হবে না।

'হ, ঠিকই। কম বুইঝি কাজ হলি বেশি বুইঝি লাভ নেই।'

'এরপর চেয়ারম্যান অজ্ঞান হয়ে গেলে তুই চট করে ছাগল বাঁধার দড়ি দিয়ে তার হাত দুটো বেঁধে দিলি। বুড়ো মানুষ, কোনো ঝুঁকি নিতে না চাওয়াই স্বাভাবিক। ভুল বললাম?'

'জে না, এই বয়সে আর কুনো কাজেই ঝুঁকি নিয়া ঠিক হবে না।'

'হাত বাঁধা হলে বঁটিটা দিয়ে গলায় একটা পোঁচ মেরে দিলি; ঠিক কি না।'

'জে, গাঁয়ির সব মানুষ য্যাকুন বুলচি, আপনিও বুলচেন, ত্যাকুন ভুল হতি পারে না।'

'তার মানে স্বীকার করে নিচ্ছিস যে, চেয়ারম্যানকে তুই মাঝরাতে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছিস?'

'মেলা দিনের পরিকল্পনা, স্যার।' খগেন আনমনা হয়ে বলে।

দারোগা খগেনকে লকআপের ভেতর ঢোকানোর আগে সহকর্মীকে বলেন জবানবন্দিতে একটা টিপসই দিয়ে নিতে।

'স্যার, দেখছেনই তো, দুই হাতই কাটা। কনুই-ই নেই তো আঙুল পাব কোথা থেকে!'

'তাই তো। আচ্ছা, ঢুকিয়ে দে।' দারোগা বলেন। তাকে খুব খুশিখুশি মনে হয়।

লকআপে নেওয়ার সময় কনস্টেবল একবার জিজ্ঞাসা করে, 'হাত কাটছে ক্যামনে? চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা খাইছিলা নাকি?'

খগেন কোনো উত্তর করে না। একবার মনে হলো বলে, যুদ্ধে খগেনের হাত দুটো কেটে নিয়েছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা। চেয়ারম্যান তখন যুবক, শক্ত করে খগেনের পা দুটো বেঁধে দিয়েছিল। বলতে গিয়ে মনে হলো, সাজা যা হওয়ার তা তো হবেই!

শেষ মাথাটি কাটাপড়ার আগে

ঘুম থেকে উঠে যা দেখলাম তাতে আমার মাথাটা যেন সত্যি সত্যি ঘুরে গেল। প্রতিদিনের অভ্যাস-মতো বিছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিলাম। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। এরপর যখন রোজকার মতো বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথচারীদের একবার দেখে নিতে চাইলাম মাথাটা তখনই ঘুরল। প্রথমে চক্কর দিয়ে ওঠে, মুহূর্তেই মনে হয় পড়ে যাব নিচে। বারান্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত গ্রিল দিয়ে আটকানো, পড়ে যাওয়ার কোনো শঙ্কা নেই, কিন্তু মনে হলো আমি পড়ে যাচ্ছি। নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। ফের নিচে তাকালাম। রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে মাথাবিহীন মানুষ। রিকশাচালকের মাথা নেই, যে লোকটা মুদির দোকানে বসে আছে কিছু বিক্রি করবে বলে তার মাথা নেই, যে কিছু একটা কিনবে বলে দাঁড়িয়ে পকেটবিহীন টিশার্টের বুকে বারবার পকেট খুঁজে হয়রান হচ্ছে তারও মাথা নেই। ফুটপাতের উপর নিচ দিয়ে যারা হাঁটছে কারো মাথা নেই। একটা মোটরসাইকেল চলে যায় চোখের পলকে, মাথাবিহীন চালক, মাথাবিহীন পেছনে কেউ বসে। ফুটপাতে দুজন পড়ে আছে, মৃত কিংবা জীবিত, মাথা নেই তাদেরও। কাঁধের উপর মাথা যেখানে থাকে সেখানটা এমনভাবে ভোঁতা যেন কোনোদিনই এদের মাথা ছিল না। মাথাবিহীন অন্যরকম এক প্রাণী জগতের বাসিন্দা মনে হয় নিজেকে।

আমার তখনও বিশ্বাস হয়নি। মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ দৃশ্যটা স্বপ্নে দেখছি। স্বপ্নে তো কতকিছুই দেখি আমরা—সবকিছুর কি মাথামুণ্ডু থাকে! এরপর ঘরে এসে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে পানির ছটা দিয়ে নিই। জেগে আছি এটা আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার। দেখি সব ঠিকই আছে। তলপেটে প্রস্রাবের চাপ অনুভব করলে হালকা হয়ে নিই। সাবানের পাশে

মিনিপ্যাক শ্যাম্পু আছে। সানসিল্ক। শেভিং ফোম থাকলেও আফটার শেভ ফুরিয়ে গেছে। কোনো কিছুই এতটুকু অন্যরকম হয়নি। আবার বাইরে এসে দেখি, একই দৃশ্য। নিশ্চয় কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে। দেখার ভুল তো অবশ্যই।

রেবেকা? ছোটোবোনকে ডাক দিই। ও আসে না। ফের ডাকি। সাধারণত এক ডাকেই চলে আসে কিংবা আসতে না পারলে উত্তর নেয় পাশের ঘর থেকে। আজ এ মুহূর্তে না আসার অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। আমি নিজেই যাই রেবেকার খোঁজ নিতে। ঘর থেকে বের হতেই চোখে পড়ে মাকে। মাথা নেই। শাড়ি দেখে চিনে নিতে সমস্যা হয় না। মা আলু কুটছে বঁটিতে। মাথা নেই কিন্তু কাজ করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তার। কী চমৎকার কুচিকুচি করে আলু কাটছেন ধারালো বঁটিতে! তাতে আশ্চর্য হই না। মা এভাবেই সংসারে রোবটের মতো কাজ করে যাচ্ছেন বহু বছর ধরে। মাথা থাকা না থাকাতে তার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না। এরপর বাবাকে দেখি। তিনি হাতে পেপারটা ধরে আছেন। শেয়ার বাজারে ধস নামার পর থেকে তিনি সকাল সন্ধ্যা পেপার খুলে বসে থাকেন। কিছু পড়েন কিনা বোঝা যায় না। পেপারে যে ছবিগুলো ছাপা হয়েছে সেখানেও কারো মাথা দেখি না। একজনের পাঞ্জাবি পরা ছবি, আঙুল তোলা, ছবির নিচে লেখা জনসভায় বক্তৃতা করছেন মন্ত্রী। বিনোদনের পৃষ্ঠায় ব্রা পরা নায়িকার বড় ছবি। মাথা নেই বলে আন্দাজ করা যায় না। নারীর এমন পোশাক থাকলে চেহারা দেখার খুব প্রয়োজনও থাকে না পুরুষের।

মাথা নেই মানে কান নেই, চোখ নেই, মুখ নেই, নাক নেই। বাড়িতে কাউকে ডেকে কাজ হবে না। কেউ শুনবে না, কেউ দেখবে না, কেউ কথা বলবে না। দেহের এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ এক মাথাতেই কেন দেওয়া হয়েছে, এটা ভেবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিরক্তি আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাই, মাথা না থাকার কারণে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছে। পাশের বিল্ডিংয়ে আগুন ধরেছে, মানুষ পুড়ে মরছে, কেউ দেখছে না সে দৃশ্য। রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। গাড়ি চলছে। চালকের মাথা নেই। পথচারীও হাঁটছে মাথাবিহীন। মানুষ চাপা পড়ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে পথ। মানুষ মানুষে ধাক্কা লেগে বদলে যাচ্ছে গন্তব্য। যে যাচ্ছিলো সামনে, ধাক্কা লেগে ঘুরে পিছনে হাঁটা শুরু করে।

আমার এতক্ষণে মনে হয়, রেবেকা কোনো কারণে নিচে নেমে পথ ভুল করতে পারে, গাড়িচাপা পড়তে পারে, পথ ভুল করে ভুল বাড়িতেও চলে যেতে পারে। আমি রাস্তায় নামি রেবেকাকে খুঁজতে। মাথাবিহীন মানুষের সড়কে একমাত্র মাথাযুক্ত মানুষ হিসেবে আমার চলতে অসুবিধা হয়। মাথাবিহীন মানুষগুলোর মতো নিশ্চিন্তে হেঁটে যেতে পারি না দেখে কষ্ট বাড়ে।

একটা গাড়ি তিন রাস্তার মোড়ে মাসহ শিশুকে থেঁতলে চলে যায়। আমি চিৎকার দিয়ে উঠি। শিশুটা তখনও বেঁচে। মাথা নেই, পা-দুটো কাটা গেছে গাড়ির নিচে। আমি চিৎকার দিয়ে আশপাশের মানুষের কাছে সাহায্য চাই। কেউ এগিয়ে আসে না। কেউ শোনে না আমার ডাক। শিশুটির রক্তের মধ্যে ছটফটানি এবং রক্তের ভেতর ডুবে যাওয়ার দৃশ্যটি কেউ দেখে না। উল্টো দিকে চোখে পড়ে একটা লোক নারীর শরীর ভেবে এক কিশোরকে নগ্ন করার চেষ্টা করছে। আমি দ্রুত গিয়ে কিশোরকে সরিয়ে দিই। লোকটি সামনে হাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক নারীর বুকে হাত রাখে। লোকটি এবার আরও নিশ্চিত হয়ে তার শাড়িটা খুলে ফেলে। নারীটি চিৎকার দেয় কিনা বোঝা যায় না। মাথা না থাকলে মানুষের চিৎকার দেওয়ার, দ্রোহ প্রকাশ করার ভাষা থাকে না। মেয়েটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে এমন দৃশ্য আরও চোখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কোনো দৃশ্যের দিকেই যাওয়া হয় না আমার। সম্মুখে কিংবা পেছনে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে নারী অথবা শিশু। ছেলে শিশু কিংবা মেয়ে শিশু। কেউ দেখে না। কেউ শোনে না। কোনো দিক থেকে প্রতিবাদ আসে না। আমি প্রতিবাদ করতে গিয়ে দৃশ্যপটের জড়সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

একদল যুবক আসে সামনে থেকে। বিচ্ছিন্ন দল। কেউ কাউকে চেনে কিংবা চেনে না। পথ হারিয়ে ভুল পথে ভুল করে তারা এক হয়েছে বলে মনে হয়। তিনজনের হাতে চাপাতি। একজনের হাতে লোহার রড। অন্যজনের হাতে পিস্তল। চাপাতি হাতের যুবকেরা হাঁটার সময় ধারাল চাপাতি সামনে-পেছনে ঘোরাতে থাকে ব্যাটারি চালিত রোবটের মতো। খানিক পর পর পড়ে যাচ্ছে কেউ সামনে। কারো যেহেতু মাথা নেই, মাথা কাটা পড়ার আশঙ্কাও থাকে না— কারো হাত কাটা পড়ে, কারও পা, কারও পেটের ভেতর থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে বাইরে। রড হাতে নিয়ে হাঁটা যুবকটির শরীরে যখন কেউ ধাক্কা খায়, তখন সে আন্দাজে বসিয়ে দেয় বরাবর। পিস্তল ধরা যুবক গুলি করেই যায় অনর্গল। যেহেতু

তার মাথা নেই, গুলি শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বোঝার কথা না। যুবকেরা চার রাস্তার মোড়ে এসে আলাদা হয়ে যায়। পায়ের নিচে ছেঁচে উপচে পড়া নোংরা পানির মতো থকথক করছে রক্ত, নাড়িভুঁড়ি। মানুষগুলো যেহেতু দেখছে না, শুনছে না, মৃত-শরীরের পচা-গন্ধ নিতে পারছে না, কেউ যেহেতু চিৎকার করতে পারছে না, ফলে মুহূর্তের এই বীভৎস চিত্র জীবিত মানুষগুলোর ভেতর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। তারা নির্বিঘ্নে হেঁটে যায় রক্তের ভেতর পা টেনে টেনে। তাদের যেহেতু মাথা নেই, পৃথিবীর কোনো কিছুতেই আর মাথাব্যথা হওয়ার দায় থাকে না।

আমার সঙ্গে ধাক্কা লাগে একজনের। আরেকজন এসে ধাক্কা দেয় পেছন থেকে। আমি চমকে উঠি। একটু আগে দেখা যুবকদের মতো এদের কারো হাতে চাপাতি কিংবা রড থাকলে আমার আর বেঁচে থাকা হতো না। বেঁচে থাকলেও হয়তো মাথা থাকত না। আমাকে আরও সাবধানী হয়ে চলতে হয়। মাথাবিহীন মানুষের মধ্যে মাথাসমেত মানুষের এ এক জটিল সমস্যা।

আমি হাঁটতে থাকি, সামনে পেছনে তাকিয়ে। এতক্ষণে ছোটোভাই রবির কথাও মনে পড়ে। রবিকেও বাড়িতে দেখিনি। রেবেকা আর রবিকে খুঁজতে খুঁজতে অনেকটা পথ হাটা হয়ে যায়। রুবিদের বাড়ির সামনে এসে রুবির কথা মনে পড়ে। রুবি আমার প্রেমিকা। পারিবারিকভাবে আমাদের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার পথে। রুবির অবস্থা কেমন জানি না। ওদের বাড়ির গেট খোলা। দারোয়ান বসে আছে মাথাবিহীন। আমি উঠে পড়ি দোতলায়। রুবির মা ড্রয়িংরুমের অ্যাটাচ বাথরুমে গোসল করছে, নগ্ন হয়ে। দরজা খোলা। সামনেই এক ছেলে বসা। মাথাবিহীন। পাশের ঘরে দরজা খোলা রেখে সঙ্গম করছে আরেক ছেলে। মাথাবিহীন সঙ্গমরত নারী-পুরুষ। মাথা না থাকার কারণে রুবির কোন ভাই কোন ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে সঙ্গম করছে বুঝতে পারি না। যেহেতু ওদের মাথা নেই, নিজেদের নগ্নতা ও যৌনতা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা থাকার কথা না। শাশুড়ির নগ্ন শরীর, হবু স্ত্রীর ভাই-ভাবির সঙ্গমদৃশ্য দেখা অনুচিত কাজ। আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। মাথা থাকলে ন্যায়বোধ থাকবে, লজ্জা হবে। আমি এসব দৃশ্যের সামনে মাথাটা লুকোনোর চেষ্টা করি। মাথার কারণে খুব বিব্রত হই নিজের কাছে। রুবিও এভাবে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় নগ্ন হতে এবং অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে

মিলিত হতে পারে ভেবে আমি চমকে উঠি। ওর ঘরে যাই। ও বসে আছে বিছানায়। শরীরে কাপড় আছে দেখে আশ্বস্ত হই। মাথাবিহীন রুবিকে দেখে শুরুতে অস্বস্তি হলেও এতক্ষণে মাথাবিহীন মানুষ দেখে দেখে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে রুবিকে জড়িয়ে ধরতে আমার সমস্যা হয় না। রুবিও আমাকে জড়িয়ে ধরে। ও আমাকে চিনে নাকি না-চিনে ধরেছে আমি নিশ্চিত হতে পারি না। রুবি আমার শরীরে এখানে-সেখানে হাত দিতে দিতে মাথায় হাত পড়ে যায়। ও সরে যায় আমার কাছ থেকে। ওর শারীরিক অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারি, ভয় পেয়েছে। রুবিকে বোঝাতে পারি না, আমার এ মাথা থাকার পেছনে আমার কোনো হাত নেই। আমি ঘুম থেকে উঠে দেখেছি সকলের মাথা নেই, আমার আছে। আমারটা থেকে গেলে আমি কী করতে পারি! রুবি দেয়ালে ঠোকা খেতে খেতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আমার মাথা আছে বুঝতে পেরে ও ভয়ে চিৎকার করে কিনা বুঝতে পারি না।

আমি নিরাশ হয়ে বের হয়ে আসি। আমার মাথা থাকার কারণে রুবিকে হারাতে হয়। রাস্তার মোড়ে এসে রেবেকাকে পাই। পড়ে আছে রক্তাক্ত। কিন্তু মাথা না থাকার কারণে নিশ্চিত হতে পারি না। একই পোশাক, বয়স ও শরীরের গড়নের আরও নারী থাকতে পারে এই শহরে। গাড়িটি চাপা দিয়ে সামনে থানার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে আছে। ভেতর থেকে আহত ড্রাইভার বের হওয়ার চেষ্টা করছে। আমি গিয়ে ধরি ওকে। রেবেকার মতো দেখতে মেয়েটি—রেবেকা হোক আর না-হোক—এরকম প্রকাশ্যে মানুষ হত্যার প্রতিবাদ করা দরকার। আমার যেহেতু মাথা আছে, আমি চাইলেও প্রতিবাদ না করে থাকতে পারি না। মাথা থাকার এই এক অসুবিধা, এখন যা সকলের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, সেটাও মানতে পারছি না। দেয়ালে থানা লেখা দেখেই বুদ্ধিটা আসে। মাথা যেহেতু আছে, এমন বুদ্ধি আসা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবুও নিজের চিন্তা করার ক্ষমতা দেখে নিজেই উদ্বিগ্ন হই। নিজেকে অস্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয়। পরিস্থিতির সঙ্গে খুব বেমানান ঠেকে নিজেকে। খুনি ড্রাইভারকে ধরে থানার ভেতর নিয়ে যাই। দেশে থানা-পুলিশ যখন আছে, নিশ্চয় কিছু আইনকানুন আছে— এভাবে নির্বিঘ্নে একজন অন্যজনকে হত্যা করতে পারে না! ডিউটিরত অফিসার টেবিলে বসা। মাথাবিহীন। আমি ড্রাইভারকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই তিনজন পুলিশ খুনি ড্রাইভারকে ছেড়ে আমাকে ধরে লকআপে ঢুকিয়ে ফেলেন। মাথাবিহীন মানুষের আরেক

পরিচয় ওরা বোধবুদ্ধিশূন্য মানুষ। আমি ওদের কিছুতেই বোঝাতে পারি না। যার মাথা নেই তাকে বোঝানোর কোনো পদ্ধতি আমার জানা নেই। খুনি ড্রাইভারকে হ্যান্ডশেক করে ওরা ছেড়ে দেন। আমাকে বন্দি থাকতে হয় সারাদিন। সন্ধ্যার দিকে মাথাবিহীন দুজন পুলিশ একজন মাথাবিহীন বয়স্ক লোককে ধরে আনে। লকআপ খোলার সময় আমি কৌশলে বের হয়ে আসি।

থানা থেকে বের হতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়ে একটা চেক-পয়েন্ট চোখে পড়ে। মাথাবিহীন পুলিশেরা দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ, যে মানুষগুলোর সঙ্গে তাদের ধাক্কা লাগছে তারা তাদের মাথা আছে কিনা হাত দিয়ে পরখ করে দেখছেন। হাতে তাদের ধারালো অস্ত্র। বুঝতে অসুবিধা হয় না, মাথা থাকলে কেটে ফেলা হবে। মাথাবিহীন মানুষের রাষ্ট্রে কারো মাথা থাকা নিশ্চয় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। এই মুহূর্তে মাথা থাকার কারণে নিজেকে অপরাধী মনে হয় আমার। হতে পারে আমি ছাড়া আর কারও মাথা নেই। কিংবা যাদের মাথা আছে, যাদের নির্দেশে এই শহর কিংবা গোটা দেশের, হতে পারে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে মাথাবিহীন করে দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে, তাদের মাথাটাই কেবল অক্ষত আছে। কিংবা আদৌ নিশ্চিত হতে পারি না এই মুহূর্তে দেশে কিংবা পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কোনো মানুষের মাথা আছে কিনা।

মাথাবিহীন মানুষের মাঝে একা মাথা নিয়ে বেঁচে থাকা যে কত অভিশপ্ত তা আমি এরইমধ্যে টের পেয়েছি। আমি অবশ্যই বেঁচে থাকতে চাই। বোধবুদ্ধিহীন মানুষের মাঝে নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় এখন মাথাটা ফেলে দেওয়া। এ দায়িত্ব পালনে আমার সামনে খোলা অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনী, আমি গেলে ওরা অফিসিয়ালি আমার মাথাটা কেটে নেবে। অন্যদিকে কতকগুলো যুবক খোলা চাপাতি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরে, পথে পথে। ওদের সামনে মাথা পাতলে, ওরাও কেটে দেবে। অফিসিয়ালি না আনঅফিসিয়ালি— কোন পদ্ধতি ভালো হবে? আমি ভাবি। যেভাবেই হোক, মাথা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার আমার, কিন্তু মাথা যেহেতু আছে, মাথা ফেলার এই পদ্ধতিগত চিন্তা থেকে বের হতে পারি না।

স্পাই

বৃহস্পতিবার। আধবেলা স্কুল। ছুটি হয়েছে দুটোয়, বাড়ি পৌছতে পৌছতে আরও ত্রিশ মিনিট। আমাদের বৈঠকখানার সামনে তখন বিভিন্ন বয়সি মানুষের জটলা। ছোটো হওয়ার কারণে অন্যদের পায়ের ফাঁক গলিয়ে সামনের দিকে যেতে কোনো অসুবিধা হলো না। দেখি, একটা লোক থেবড়িয়ে বসে আছে মাটির উপর। চটের বস্তা শরীরে জড়ানো। বুড়ো চীনাদের মতো দাড়ি। জটপাকানো চুল। স্মরণকালে হয়তো চুল কাটেনি, ধোয়ওনি। বয়স অমরত্ব প্রাপ্তির পর বৃদ্ধ হতে হতে কোনো একটা পর্যায়ে আটকে গেল যেমন দেখানোর কথা। তখনো কিছু বুঝে উঠতে পারিনি; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম লোকটিকে। পায়ের কাছে একটা ব্যাগ পড়ে। তলাটা ছেঁড়া, কিছু যে থাকবে না, বোঝাই যাচ্ছে। ব্যাগের এক কোনা শক্ত করে ধরে রেখেছে, সে জন্যেই কিছু না থাকা সত্ত্বেও ব্যাগটি ধরে টানাটানি করছে টোটন মামা। লোকটি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না। টোটন মামা এক টানে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল দূরে। ফেলবেই যখন নেওয়ার কি দরকার? এই সামান্য প্রশ্নটুকু করবার মতো মানুষ সেখানে ছিল না। সকলে মজা দেখছে দাঁড়িয়ে। কতদিন পর যেন তারা কিছু দেখে মজা পাচ্ছে। আগে গ্রামে যাত্রাপালা হতো, অশ্লীলতার অভিযোগে এখন আর হয় না। বড়ভাইদের মুখে স্কুলমাঠে সার্কাস হওয়ার গল্প শুনেছি। সেটিও বন্ধ হয়েছে চিরকালের মতো। গ্রামের মানুষের মজা করার যে গল্প শুনেছি এতদিন, আজ দেখছি সচক্ষে।

ফকির হলি হতি পারে। ফজু চাচা বলে।

আশপাশের দশ গাঁয়ি দেকিছি বুলি মনে হচ্ছি না। পেছন থেকে হাফি চাচার কণ্ঠ শুনি।

আজ শুক্কুরবার না। তাছাড়া ফকির হলি ভিক্ষি তুলার ঝুলা থাকতুক। এমুন করি পড়ি না থেকি বাড়ি বাড়ি যাতুক। মবু ভাই ভুল বলেনি। আমাদের এখানে শুক্রবার ফকির আসে। অন্য দিনগুলোতেও দুয়েকজন আসে। এলাকার ফকিরদের নামসহ আমাদের চেনা। কিন্তু এই লোকটিকে কেউ চিনতে পারে না। হাফি চাচার মতো পুরোনো মানুষও যখন কখনো দেখেনি বলে ঘোষণা দিল, অন্যরা আর কী বলবে!

এই মুরুব্বি, তোর নাম কী? কুতা থেকি এইচির? কুউন গাঁতে বাড়ি? একিনে চাস কী? কেমুন করি আসলি? শোয়েব ভাই হাতের কঞ্চি দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে প্রশ্নগুলো একটার পিটে আরেকটা বসিয়ে যায়।

মুখ দি একটা শব্দও বের করতি পারলাম না; আর তুই খবরের লোকদের মতোন সাক্ষাৎকার নিতি চাচ্ছিস! শোয়েব ভাইকে উদ্দেশ করে আমাদের অঙ্কের মাস্টার বিলু স্যার বলে।

লোকটি কোনো কথা বলে না। কঞ্চির খোঁচাতে হাত ও পিঠে খেলেও গেছে। লোকটি চুপচাপ তাকিয়ে থাকে মাটির দিকে। নিজের মতো আনমনে কী যেন আঁকাআঁকি করে ধুলোয়। কিছু একটা বোঝা যায় তো পর-মুহূর্তেই অন্য একটা দাগ টেনে গুলিয়ে ফেলে।

কেউ আসতি দেকিছে?

কে দেকিছে পয়লা?

হেঁটি এসিছে?

একটার পর একটা প্রশ্ন আসতে থাকে। আছরের আজান হয়ে যায়। কেউ কেউ নামাজও পড়ে আসে। এক মানুষ যায়, নতুন মানুষ আসে, জটলা একটি বারের জন্যও হালকা হয় না। লোকজন একবার করে খোঁচা দেয় হাতের কাছে যা থাকে তা দিয়ে, সরে আসে। খুব কাছে কেউ যায় না—অচেনা কুকুর নিয়ে খেললে আমরা এমন নিরাপদ দূরত্ব রেখে দিই। পাড়ার মোড়ের বুড়ো শজনে গাছ থেকে আমরা যে-রকম খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঠা বের করি, গাছটি নড়েও না চড়েও না, এই অচেনা বৃদ্ধও সে-রকম প্রাণ থেকেও জড়ের মতো পড়ে থাকে। গাছের মতো একটিবারও নিজে থেকে জানান দেয় না তার প্রাণ থাকার কথা। একদল হতাশ হয়, অন্যদল নতুন উদ্যম নিয়ে শুরু করে। একটা পরিপূর্ণ শব্দ ওর মুখ থেকে বের করতে পারলে সে যেন গ্রামে বীরের মর্যাদা পাবে!

আমরা যখন একঘেয়ে দৃশ্যে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম, তখনই আমাদের মধ্য থেকে বোমাটা ফাটাল কেউ।

স্পাই! দেখো-গে ভারতের স্পাই। বোবা-পাগলের ছদ্ম ধরি তথ্য নি পালাচ্ছি। কেউ একজন বলল ভিড়ের ভেতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে জনতা চঞ্চল হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মুহূর্তে সকলে যেন নিশ্চিত হয়ে গেল, লোকটি স্পাই ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। গ্রামের পশ্চিমে মাইল ছয়েক গেলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। আমাদের গোপন কোনো তথ্য নিয়ে সীমান্ত দিয়ে পালাচ্ছে বলে আমরা ধরে নিলাম।

স্পাইদের নিয়ে গ্রামে অনেক গল্পের প্রচলন ছিল। একটা গল্পের কথা তখনই মনে পড়ল। এরা এমন কৌশলী ও দায়িত্ববান দেশপ্রেমিক হয় যে কোনো দেশে স্পাইগিরি করতে গিয়ে বিয়ে-সংসার পর্যন্ত করে, তারপর মিশন শেষ হলে বিনা বাক্যে স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যায়। এমনভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে, তাদের এই ছদ্মবেশ ধরাও যায় না।

আমাদের ভেতর থেকে কেউ কেউ এরইমধ্যে পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। প্রথমেই একজন কঞ্চির মাথায় চুলগুলো পেঁচিয়ে টান মারল জোরে। নকল চুল হলে উঠে আসত। কিন্তু মাত্র কয়েকটা চুল ছিঁড়ে এলো। লোকটির গায়ের রঙ আসল কিনা, মুখে মেকআপ দেওয়া কিনা, পরীক্ষা করার জন্য হাবু ভাই পেছনের গর্ত থেকে এক বালতি পানি তুলে ওর মাথায় ঢেলে দিলো। গায়ের রঙ যেমন ছিল তেমনই থাকল মাঝখান থেকে সকলের সন্দেহটা থেকে গেল।

কাপড়চোপড় খুলি দেখা দরকার কুনো কাগজপত্র বা চিরকুট আছে কিনা? হাফিজুল ভাই বলে। লোকজন তার কথাই উৎসাহ পায়। কাপড়চোপড় বলতে তেলচিটচিটে চটের বস্তা। তাও শরীরের সামান্য অংশ ঢাকা। সেটুকুই খোলার জন্য কয়েকজন এমনিতেই সুযোগ খুঁজছিল; এতক্ষণে তারা জন-সম্মতি পেয়ে গেল। নারীরা একটু সরে দাঁড়াল। চটের বস্তাটা শরীর থেকে আলাদা করতে কষ্ট হলো না। হাত লাগাতে হয়নি। লাঠির মাথা দিয়ে টানাটানি করতে করতে কিছুটা ছিঁড়ে কিছুটা খসে শরীরটা আলগা হয়ে গেল। আমরা চারপাশ থেকে ঘুরেফিরে দেখলাম। কাগজের ছিটেফোঁটাও নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন এমন একটা বিষয় আবিষ্কার করল যে, তাতে বৃদ্ধের স্পাই পরিচয় নিয়ে কারো ভেতর আর কোনো সন্দেহ থাকল না। হিন্দু হলে ভারতীয় স্পাই হবে এরকম একটা বিশ্বাস বাতাসে কে বা কারা যেন কবে ভাসিয়ে দিয়েছে, আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে তা রক্তে মিশে গেছে।

লোকজন মোটামুটি নিশ্চিত হলো যে, কাগজ বা চিরকুট নিশ্চয় ছিল কাছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যা করা উচিত, তাই করেছে, খেয়ে

ফেলেছে। পেটটা চিরে দেখা সম্ভব হলে পাওয়া যেত। কিন্তু ততদূর করা সম্ভব নয়। কারো কারো মনে ইচ্ছা থাকলেও স্রেফ অনভ্যস্ততার কারণেই লোকটির পেট কেউ চেরার কথা ভাবতে যায় না। লোকজন চাইলে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে। পেট চেরার চেয়ে গণধোলাই অনেক সহজ বিষয়। কিন্তু তাতে সে যে-তথ্য নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো জানা যাবে না।

থানায় দিই। পুলিশের হাতে পড়লি পিটি সব তথ্য বের করি নেবে। একজন বলে।

সেই ভালো। একটা খবর হলি দেশের মানুষ জানবি আমাদের উপর হিন্দুদের স্পাইগিরির ব্যাপারটি। মেরি ফেলা ঠিক হবে না। অন্য একজন বলে। ততক্ষণে দিনের আলো নিভে গেছে। অন্ধকারে অনেকের মধ্যে কে কথা বলছে ঠিক মতো বোঝা যায় না। সিদ্ধান্ত যখন একরকম চূড়ান্ত হয়ে এসেছে তখনই মা এলো।

যা করার সকালে করিস। সব্বাই ফিরি যা। সারাদিন কিছু খায়নি; খাবে। পাড়ার লোকজন মাকে ভয় না সমীহ করত জানি না, মা বলাতে মৃদু প্রতিবাদ উঠলেও সেটা দানা বাঁধতে পারল না। সকালে মার কাছ থেকে বুঝে নেবে এমন শর্তে লোকজন যে যার মতো সরে গেল অন্ধকারে। লোকটিকে দু তিনজন মিলে ধরে বৈঠকখানার ভেতরে তোলা হলো। খাইয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখা হবে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও এলাম ভাত আর তরকারি নিয়ে। হারিকেনের আলোয় মা একটা থালে ভাত, পাশে দুটো বাটিতে আলাদা আলাদা করে তরকারি দিল। মাছ আর ডাল। বৃদ্ধ এখন নড়ছে। হালকা বাতাসে গাছের পাতা নড়ার মতোন। হারিকেনের আলোয় মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে প্লেটের শুধু ভাত নাড়তে লাগল। মা নিজে ডালের বাটিটা ঢেলে মাছটা দিতে গেলে ইশারা করে বারণ করল।

জিজ্ঞাসা করো তো কোথা থেকে এসেছে? মাকে বললাম। মনে হচ্ছিল মা এখন কিছু জানতে চাইলে বলবে। কিন্তু মা কোনো প্রশ্ন করল না। পাশে বসে থেকে খাওয়াল। খাওয়া শেষ হলে আমাকে নিয়ে বের হয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল। যে দু-একজন দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও আমাদের দেখাদেখি সরে গেল।

সেদিন শুতে গেলাম চাপা উত্তেজনা নিয়ে। থানায় খবর চলে গেছে। সকালে পুলিশ আসবে। শুক্রবার, স্কুল নেই। থাকলেও যেতাম না। এমন ঘটনার সাক্ষী হবার সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসে না। আমি নিশ্চিত গ্রামের প্রত্যেকে সেদিন উত্তেজনায় ঘুমাতে পারেনি। আমার ঘুমটা এলো

বেশ দেরিতে। ভোর রাতের দিকে। তাই উঠতে পারলাম না সময় মতো। বাইরে হৈচৈ না হলে হয়তো আরও কিছুক্ষণ ঘুমতাম। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দেখি লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা আর অসন্তোষ। লোকটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরে থেকে তালা আটকানো আছে ঠিকই, কিন্তু ভেতরে সে নেই। মা একবাক্যে বলে দিয়েছে, লোকজনের ছুমুতে ভেতরে রেখি তালা দি শুইছি। একুন কীভাবে কী হলু আমি কি জানি!

ততক্ষণে আশপাশের গ্রামে, সীমান্তের দিকে লোকজন চলে গেছে খুঁজতে। একজন এও বলল, লোকটা মানুষ না, জিন। অন্য একজন প্রশ্ন করল, জিন হেঁদু হয় নাকি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেউ এগিয়ে এলো না। এর ভেতর রহস্য যে একটা আছে, এ নিয়ে কারও মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকল না।

বিকাল পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধান পাওয়া গেল না। বর্ণনামতো কোনো মানুষ আশপাশের গ্রামের কেউ দেখেছে বলেও তথ্য পাওয়া গেল না। আমি নিজে অন্যদের সঙ্গে আখ-খেতের ভেতর লাঠি দিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজেছি। একটা লোক কীভাবে এলো, কীভাবে গেল কেউ কিছু বলতে পারে না।

রাতে একরকম হতাশা আর গা ছমছমে অনুভূতি নিয়ে শুতে গেলাম। পাশের ঘর থেকে বাবা-মায়ের চাপা কণ্ঠে কথা কাটাকাটির শব্দ আসে।

তুমি কাজটা ঠিক করলে না? বাবা বলে।

তুমরা ঠিক করছিলে তো? স্পাই বুলি পুলিশের হাতে তুলি দিতি বাধছিল না? মা প্রশ্ন করে।

স্পাই কিনা সেটা পুলিশ দেখতুক। বাবার উত্তর।

তাই বুলি সব জেনিবুঝি?

এত বছর পর এসিছে কেনে?

এটা ওর দেশ। বাড়ি। জন্মভিটি। আসতিই পারে।

বুললিই তো হলু না। বাড়িঘর জমি-জায়গা আর তার আছে নাকি?

বউ আর মেয়িকে ঘরের মধ্যি আটকি রেকি পুড়ি মারলু পাকিস্তানিরা। দেশ স্বাধীন হলি একা মানুষটাকে পাগল বানি' দেশছাড়া করলি তুমরা। একুন আবার স্পাই বুলি পুলিশের হাতে তুলি দিচ্ছ, আর কত অবিচার করবা মানুষটার উপর? মা এবার চড়া কণ্ঠে বলে।

আস্তে। ছেলিরা ঘুমাচ্ছি। বাবা ধমকের সুরে থামিয়ে দেয়। বাড়িজুড়ে আদিম নীরবতা নেমে আসে।

মানুষের মাংসের রেস্তোরাঁ

বড় বড় করে লাল অক্ষরে লেখা 'এখানে মানুষের খাটি মাংস পাওয়া যায়'। হারুন আমাকে দেখিয়ে বলে, দেখ 'খাঁটি' শব্দে চন্দ্রবিন্দু বসায়নি। আমি নিশ্চিত ভেজাল মাংস রাঁধে! হারুন অনেক বছর আগে একটা পত্রিকা অফিসে প্রুফ দেখার কাজ করত, সেই থেকে ভুল বানান দেখলে এভাবে একটা সিদ্ধান্তে চলে আসে। একবার ছোটবোনের বিয়ে ঠিক হলো, ছেলের নাম আবদুচ ছলিম। নামের বানান দেখার পর বিয়েটা ভেঙে দিল। বলল, যার নামের বানানে গণ্ডগোল, সে ছেলে সুবিধার হতেই পারে না।

মানুষের মাংসের চাহিদা বাড়ার পর রাজধানীর এই এলিট অঞ্চলে আরও কিছু হোটেলে মানুষের মাংস বিক্রি করা হয়, তাই কয়েকটি হোটেলের ব্যানারে মানুষের খাঁটি মাংস পাওয়া যায় বলে দাবি করা হয়েছে। কদিন আগে একটা দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল 'মানুষের নামে কুকুকের মাংস!' শিরোনামে। এরপর হোটেলগুলো বুঝেসুঝে নামকরণ করেছে। একটা হোটেলের নাম যেমন, 'ওল্ড মানুষের মাংস রেস্তোরাঁ'। আরেকটার নাম 'নিউ মানুষের মাংস রেস্টুরেন্ট'। বিপরীতে চোখে পড়ে 'অরিজিনাল মানুষের মাংস ভোজ' শীর্ষক হোটেলটি। কোনো এলাকায় একটি খাবার বিখ্যাত হয়ে গেলে অনেকে সেই বিখ্যাত খাবারের প্রকৃত মালিক বলে এভাবে দাবি তোলে।

মানুষের বলে কুকুরের মাংস খাইয়ে দেবে না-তো? হারুন বলে।

এই কারণেই তো হোটেলের নাম জেনে এসেছি। ওকে আশ্বস্ত করি।

আমরা, মানে আমি আর হারুন 'Meet Human Meat' হোটেলে এসেছি বন্ধু ইমরোজের পরামর্শে। ইমরোজের বাড়ি এই এলাকায়, ও

জানে মানুষের সুস্বাদু মাংস কোথায় পাওয়া যায়। নিজের এলাকা বলে নয়, ইমরোজ দেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো কোন জেলায় কোনটা অথেনটিক বলে দিতে পারে। শুধু খাওয়ার জন্য কোনো মানুষের জন্ম হয় কিনা জানি না, ইমরোজের হয়েছে বলে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। সকালেই ইমরোজকে ফোন দিই। ও জানায় 'মিট হিউম্যান মিট' খুব নাম করা না হলেও মানুষের মাংস রাঁধে ভালো। বিশেষ করে ফ্রাইটা দারুণ হয় এখানে। রেজালাটা ভালো করে 'ওল্ড মানুষের মাংস রেস্তোরাঁ'। আমি রেজালা পছন্দ করলেও হারুন বলল ফ্রাই খাবে। বিলটা যেহেতু হারুনই দেবে, আমি আর না করতে পারলাম না।

আমরা 'মিট হিউম্যান মিট'-এ এলাম। হোটেলের মালিক একজন সাবেক মন্ত্রী। দেয়ালে বড় করে তার ছবি টাঙানো। ছবিটার নিচের টেবিলে আমরা বসেছি। এদিকে আলো ও মানুষের চাপ, দুটোই কম। গল্প করতে করতে সময় নিয়ে খাওয়া যাবে। মানুষের মাংস দ্রুত খেলে নাকি স্বাদ পাওয়া যায় না। মুখের ভেতর অনেকক্ষণ রেখে গিলতে হয়। এটাও ইমরোজের বলা।

আমাদের সামনে মেন্যু নিয়ে আসে অল্পবয়সি এক ওয়েটার।

স্যার কি অর্ডার করবেন? ছেলেটি মেন্যুটা হাতে রেখেই জানতে চায়।

মানুষের মাংসের কী কী রেসিপি আছে তোমাদের? হারুন জিজ্ঞাসা করে।

দুপুরে ফ্রাই, রেজালা, ঝোল, বটি—এগুলো আছে। একটু সময় দিলে স্পেশাল খিচুড়ি ও বিরানি হবে। মাথার মাংস ও হাড়ের নেহারি খেতে চাইলে সকালে আসতে হবে। তেহারি ও কাচ্চি পাবেন রাতে। ছেলেটি তিনবেলার মেন্যুই জানিয়ে দেয়।

এখানকার স্পেশাল কোনটা? আমি জিজ্ঞাসা করি।

দুপুরের মেন্যুতে ফ্রাই অথবা ভুনা। তবে আজ রেজালাও ভালো হবে। শিশুর মাংস এসেছে। হাড়গুলো চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবেন। মুখে একদম বাধবে না। চর্বিওয়ালা গোশত পছন্দ করলে মোটাগোটা মেয়েমানুষের বুকের ও রানের মাংস আছে। ঝোলটা ভালো হয়েছে।

বয়স কেমন? হারুন বলে।

আমার?

মোটাগোটা মেয়েটার কথা বললে? বুড়ো নাতো?

একদম না। ত্রিশ বছরের বেশি হবে না। খুব মোটা না, নাদুসনুদুস। যেমন ফর্সা, তেমন গড়ন। নায়িকাদের মতো লম্বা। রানে অনেক মাংস ছিল। কাটার সময় আমি নিজে দেখেছি।

শুনে তো মুখে পানি চলে এলো। দাও। সঙ্গে ফ্রাই আর বাটার নান। হারুন ওরটা বলে।

আমার জন্য ঝোল মাংস। সাথে কুচিকুচি করে পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ। নারীশরীরের রানের মাংস শুনে মনে হলো স্বাদের হবে। না হলে একটা রেজালা নিয়ে নেব। সঙ্গে পরোটা। অল্প তেলে ভাজা। আমি বলি।

ছেলেটি অর্ডার নিয়ে চলে যায়।

মানুষের মাংসের আমদানি বেড়ে যাওয়ায় দাম কিছুটা কমেছে। সিরিয়া থেকে আসছে। সবই যুদ্ধাহত। দাম বেশি বলে সব হোটেলে রাখে না। সিরিয়ার মানুষ সৌদি আর আমেরিকাতে বেশি যায়। ইসরায়েল ফিলিস্তিনি শিশুদের মাংস থেকে এক ধরনের আচার তৈরি করে বাজারে ছেড়েছে, এত দাম যে, কারো একার পক্ষে কিনে খাওয়া সম্ভব না। বিশ্বসংঘ থেকে শুরু করে বড় বড় এনজিওর মিটিংয়ে নাকি পরিবেশন করা হয়। আরবের শেখরাও এর বড়ো ক্রেতা। শুনেছি ওদিকে ইয়েমেনে দুর্ভিক্ষের কারণে বাবা-মায়েরা শিশুদের বিক্রি করে দিচ্ছে। বেশিরভাগই হাড্ডিসার, এই কারণে চাহিদা কম। চীন কিনে নিয়ে প্যাকেটজাত করে কম দামে বাজারে দিচ্ছে। বাংলাদেশে দেশি মানুষের মাংসের চাহিদা বেশি। দেশি মুরগির মতো দেশি মানুষের মাংসের স্বাদও নাকি জিভে লেগে থাকে। আজকাল আবার দেশি বলে অনেক হোটেলে রোহিঙ্গা চালিয়ে দিচ্ছে। এটা মনে করেই হারুন বোধহয় ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি উঠে আসেন আমাদের টেবিলে।

আপনাদের এখানে সব দেশি তো? হারুন জানতে চায়।

নিশ্চিন্তে খেতে পারেন। তারপরও সন্দেহ জাগলে কিচেনের পেছনের স্টোরে কাটা মাথা আছে, দেখে আসতে পারেন। টাটকা মাথা। এখানে কোনো ভগিজগি হয় না।

কোনো কোনো হোটেলে শুনেছি যাদের মাংস রান্না হয়েছে তাদের ছবি রাখা হয়। মানুষ দেখে অর্ডার করতে পারে? আমি শোনা কথার সত্যতা কতখানি জানতে চাই।

ঠিকই শুনেছেন। আমরাই এটা শুরু করেছিলাম। পরে বন্ধ করে ফেলতে হয়েছে।

কেন? ভালো সিস্টেম তো। যার মাংস খাচ্ছি তার চেহারাটা দেখে নিলাম। বন্ধ করলেন কেন?

একবার খুব ঝামেলা হয়েছিল। তারপর থেকে বন্ধ।

কী রকম? জানতে পারি?

এক কাস্টমার ক্যাটালগ দেখতে চাইলেন। আমরা দিলাম। সাধারণত কেউ না চাইলে আমরা দিতাম না। কেউ কেউ আছে পুরাতন সেন্টিমেন্টের, ছবি দেখলে খেতে পারেন না। আবেগ চলে আসে। তো লোকটি ক্যাটালগ দেখে চিৎকার শুরু করে দিলেন। ওখানে নাকি তার মেয়ের ছবি আছে। পরে আমাদের নামে মামলা করে দেয়। তার ধারণা আমরা মেয়েটিকে তুলে এনে জবাই করেছি মাংসের জন্য।

তারপর? আপনারা সেটাও করেন নাকি?

একসঙ্গে মেয়েটি দুটো প্রেম করত। প্রথম প্রেমিক খুন করে দালালদের কাছে বিক্রি করেছে। দালাল দিয়েছে আমাদের। আসল রহস্য উন্মোচন হয়ে গেলে আমাদের আর সমস্যা হয়নি। এরপর থেকে আমরা আর ছবি দেখাই না। আমাদের একটা সুনাম আছে, মানুষ বিশ্বাস থেকে আসে। একবার যে আসে, পরেরবার তাকে আসতে হয়।

কেন? কী এমন বিশেষত্ব আপনাদের?

আমরা বাজার থেকে মরা মানুষ কিনি না। যেমন ধরুন গতকাল দেশে পনের জন খুন হয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বিশজনের মতো, ধর্ষণের পর মেরে ফেলা হয়েছে তিনজনকে। গাছের সঙ্গে বেঁধে পিটিয়ে মারা হয়েছে এক শিশুকে। আমরা একটাও কিনিনি। কম দাম যেখানে দেখবেন, ওরা কেনে। আমাদের মাংস ফ্রেশ।

তার মানে আপনারা তুলে এনে জবাই করান? নাকি তাজা মানুষ কিনতে পাওয়া যায়? হারুন প্রশ্ন করে।

তুলে আনার মতো নোংরা কাজ আমরা করি না। আর কিনতে পাওয়া গেলেও সেগুলোয় অধিকাংশ কেমিক্যাল দেওয়া। জীবন্ত হলেও ভেজাল। আমাদের নিজস্ব ফার্ম আছে। পথশিশুদের আমরা অল্প দামে কিনে নিই ওদের বাবা-মা অথবা এলাকাভিত্তিক নেতাদের কাছ থেকে। দেখেন-না ফুটপাত কেমন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে! আরামে হাঁটতে পারছেন। কিনে ওদের

যত্ন করে পালা হয়। অনেক অবিবাহিত মা জারজ সন্তানদের আমাদের কাছে বিক্রি করে যায়। ভালো দাম পায় বলে আজকাল আর কেউ গর্ভপাত ঘটায় না। এই কারণে দেখবেন নবজাতক হত্যাটাও কমেছে। ম্যানেজার বলে।

খুব ভালো। নবজাতক কিংবা ভ্রূণ হত্যার ঘটনা এত বেড়ে যাচ্ছিল যে, সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। একটা উপায় বের হয়েছে তাহলে। আমি বলি।

আমার মনে হয় প্রসূতি মায়েদের জন্যও ভালো হয়েছে। দেহব্যবসার চেয়ে এই ব্যবসাটা ভালো। পথের মেয়েরা সম্মানের সাথে জীবনধারণ করতে পারবে। হারুন বলে।

আয়ও বেশি হয়। ম্যানেজার যোগ করে।

এত দাম দিয়ে রোজ খায় কারা? আমি জানতে চাই।

টাকাওয়ালা ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ীরা। বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে অর্ডার আসে। শৌখিন মধ্যবিত্তরাও আসে, জন্মদিনে কিংবা চাকরির প্রমোশন হলে। কেউ কেউ বসকে খুশি করতে পার্সেল করে।

ম্যানেজার সানন্দে আমাদের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। বিরক্ত হচ্ছেন বলে মনে হয় না। এই কারণে আমরা আরও কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে যেতে পারি। এর মধ্যে অর্ডার নেওয়া ছেলেটা টেবিলে স্যুপ রেখে যায়।

আমরা তো স্যুপ অর্ডার করিনি? আমি বলি।

এটা কমপ্লিমেন্টরি। ফিঙ্গার স্যুপ। খান, ভুলতে পারবেন না।

শুনেই আমার জিভে জল চলে আসে। এমনিতেই অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে আমরা ক্ষুধার্ত। আমি স্যুপের একটা বাটি নিজের দিকে টেনে নিই। পাতলা ডালের রঙ, চামচ দিয়ে নাড়তেই চিংড়ির মতো কুচিকুচি করে কাটা আঙুল ভেসে ওঠে। একটা তুলে মুখে দিই। অমৃত। ভেতরের হাড়টা দাঁতের নিচে পড়ে মটমট করে। চিংড়ির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি স্বাদ। বাচ্চার আঙুল নাকি? আমি জিজ্ঞাসা করি।

আজ একটা পার্টির অর্ডারে দুটো পথশিশু জবাই হয়েছে। এই শহর থেকে দুজন অনাগত ভিক্ষুক অথবা পকেটমার কমে গেল। ম্যানেজার বলে।

বাহ! দারুণ। এই ব্যবসাটা দশ বছর আগে চালু হলে আমার আইফোনটা হারাতে হতো না। ওতো দাম দিয়ে কিনে ব্যবহারই করতে পারলাম না। হারুন শুনে খুশি হয়ে বলে।

বিষয়টা ভালো। জনসংখ্যাও কমছে। অপরাধীর পাশাপাশি আগামীতে আর বেকার থাকবে না। আমি বলি।

তবে চাহিদা যে হারে বাড়ছে তাতে সংকট তৈরি হতে পারে। হারুন বলে।

ধুর, গরিব মানুষের অভাব আছে নাকি! যুদ্ধ লেগেই আছে কোথাও না কোথাও। খুন-খারাবি গুম-অপহরণ কমছে না, বাড়ছে। এত তাড়াতাড়ি সংকট হবে না। আমি জবাব দিই।

চাহিদার কথা মাথায় রেখে আরও ফার্ম তৈরি হচ্ছে। শহরে যারা পথে পথে কুকুরের মতো পড়ে থাকে, সন্তান হলে জানে না পরদিন পাশে পাবে কিনা, কিংবা ঝামেলা এড়াতে নিজেরাই ফেলে দেয় কোনো ডাস্টবিনে, তাদের আমরা ফার্মে নিচ্ছি। ওখানে ওরা আরামে থাকবে খাবে আর গরু-ছাগলের মতো জন্ম দেবে। ম্যানেজার বলে।

এইটা ভালো হয়েছে। এতদিনে এই কীটপতঙ্গের মতো মানুষগুলো সমাজের কাজে লাগছে। চোর-বাটপারি-মাদক চোরাচালান এসব বন্ধ হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার। সমাজে এবার সত্যিকারের শান্তি ফিরে আসবে। মানুষের ভেতর নীতিনৈতিকতার বিষয়টি তো উঠেই যাচ্ছিল। হারুন খুশি হয়ে বলে।

ম্যানেজার হাসতে হাসতে উঠে যান তার আসনের দিকে।

আমরা স্যুপ শেষ করে অপেক্ষা করি।

বিশ্বের নব্বইভাগ মানুষ পশুর মতো খেটে মরছে, আর দশ ভাগ মানুষ কেমন ভোগ করছে দেখেছিস? সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র সব ব্যর্থ। ক্ষমতার রাজনীতিকে আমরা দোষ দিই, আসল অপরাধী হলো শিল্পপতিরা। না, অপরাধী আমরা, শ্যালা মধ্যবিত্তরা। হারুন বলে। ছাত্ররাজনীতি করত, সুযোগ পেলেই রাজনীতির কথা শুরু করে দেয়। আমি শিল্পীমানুষ, ওর কথায় তেমন আগ্রহ খুঁজে পাই না। সমাজ পরিবর্তন করা এখন শিল্পীদের কাজ না। শিল্পবিমুখ সমাজে সে সুযোগ আর নেই। এ ধরনের কথা আমি হারুনকে বলি। ও আমার সঙ্গে একমত হতে পারে না। গণসাহিত্যের কথা বলে। আমরা যখন বৃহত্তর সমাজ ও বঞ্চিত মানুষের অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে সিরিয়াস আলোচনার ভেতরে চলে যাই, তখনই আমাদের টেবিলে মানুষের মাংসের রেসিপি আসে। খেতে খেতে আমরা আলাপের আরও গভীরে চলে যাই।

স্যার একটু আস্তে কথা বলবেন, পাশের টেবিলে সমস্যা হচ্ছে। ওয়েটার এসে বলে। তাকিয়ে দেখি আমাদের সামনের টেবিলে কয়েকজন দেশি বিদেশি মিলে মিটিং সারছে। চোখে পড়ে এক ভদ্রলোকের হাতে একটা ফাইলে লেখা, হিউম্যান রাইটস ইন স্লামস।

মিট হিউম্যান মিট রেস্তোরাঁয় এভাবেই নাকি রোজ রোজ সমাজ বদলের তর্কে বসে বিত্তবান মানুষেরা, প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিয়ে মিটিং করে দেশি বিদেশি সংগঠনগুলো। বিল দেওয়ার সময় ম্যানেজার হাসতে হাসতে আমাদের বলে, আবার আসবেন স্যার! আমাদের মানুষের মাংসে কোনো ভেজাল নেই।

জীবনের গল্প প্রতিযোগিতা

ঈদ উপলক্ষে টানা চারদিন 'স্ট্রিট লাফটার শো' করছে বিটিএন বাংলা, হাতিরঝিলে। অনুষ্ঠানটা ভালোই সাড়া ফেলেছে। প্রতিদিন তিনটা পরিবার অংশ নেয়। প্রতিটা পরিবারে দুজন করে সদস্য থাকে—একজন নারী, একজন পুরুষ। শোতে তেমন কিছু করতে হয় না। হাসতে হয়। কারণ অকারণে হাসতে হয়। একটা করে হাসির কৌতুকও বলতে হয় অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোকে। ওদের কাজ হয় পাল্লা দিয়ে হাসা এবং একই সঙ্গে অন্যদের হাসানো। উপস্থিত দর্শক থেকে জনা বিশেক সামনে বসানো হয়। তারাও হাসে এবং জয়ী পরিবার নির্বাচন করে। বিজয়ী পরিবার পায় সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য দুদিন দুরাত গাজীপুরে একটি রিসোর্টে ফ্রি থাকা-খাওয়ার সুবিধা। অথবা রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ থেকে নগদ বিশ হাজার টাকা।

মেয়েকে নিয়ে টানা দু দিন চেষ্টার পর তৃতীয় দিনে এসে সুযোগটা পেল সুবহান মিয়া। প্রথমে সুবহান রাজি হয়নি। ভদ্রলোকের টেলিভিশন শোতে ওদের মতো সহায় সম্বলহীন মানুষকে নেবে কেন! কিন্তু খুব কষ্ট করে সুবহানের বউ লতা রাজি করিয়েছে। কিছুদিন হলো লতা কাজ হারিয়েছে। একজনের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত। যে বিছানাগত বৃদ্ধের দেখভালের জন্য ওকে রাখা হয়েছিল তিনি মারা গেছেন। এরপর আর কোথাও কাজ পাচ্ছে না। নিমতলী ট্র্যাজেডিতে মুখের অর্ধেকটা পুড়ে যাওয়ার পর থেকে কোনো বাসা বাড়িতে কাজ জোটে না।

যার কেউ নেই তার আল্লাহ আছে, দেখো! লতা বলে।

বউয়ের কথা শুনে সুবহান ঝিম ধরে বসে থাকে। রিকশাটা চুরি হওয়ার পর থেকে সে নিজেও কাজকর্মহীন। এখনই কটা টাকা না পেলে না খেয়ে থাকতে হবে।

মেয়ে মালা মায়ের সঙ্গে তাল দেয়। বলে, বাবা তুমি তো মেলা হাসো। আমিও তোমার সঙ্গে হাসব। এই দেখো আমিও ক্যামন হাসতে শিখেছি, বলে দশ বছর বয়সি মেয়েটি হিহি করে হাসতে থাকে। মালা একটা পথস্কুলে পড়ত। পড়তে গেলে একবেলা খেতে দিত। এখন সে সব বন্ধ। দেশ উন্নত হয়েছে বলে এনজিওটা ফান্ডের অভাবে গুটিয়ে গেছে। বিকাল বেলা রাস্তায় টুকে বেড়াত, গত মাসে গণ-ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর থেকে আর সাহস পাচ্ছে না।

অবশেষে সুবহান রাজি হয় মা মেয়ের চাপাচাপিতে।

কিন্তু অংশ নিতে চাইলেই তো হয় না। কত পরিবার এসে লাইন ধরে তার কী হিসেব আছে! প্রতিদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে লটারির মাধ্যমে তিনটি পরিবার নির্বাচন করা হয়। তৃতীয় দিন নির্বাচিত হয়েছে সুবহান আর মালা। ওদের সঙ্গে একটা ব্যবসায়ী আর একটা সরকারি চাকরিজীবী পরিবার আছে। বাকি দুই পরিবার থেকে অংশ নিয়েছে স্বামী-স্ত্রী।

আজকের পর্বটা ভালোই জমে উঠেছে। বিজ্ঞাপনসহ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের শো। প্রথম দুই পর্ব এরই মধ্যে শেষ। সুবহান আর লতা পাল্লা দিয়ে হেসেছে। সুবহান এমনিতেই খুব হাসতে পারে। এটা ওদের পারিবারিক রোগ। সুবহানের বাবা মাটিকাটার কাজ করত। অভাব অনটনের মধ্যেও লোকটা এত হাসত যে, পাগলের মতো দেখাত। যেদিন ওর মা ইটভাটায় জ্বালানির সঙ্গে জ্বলেপুড়ে কয়লা হলো, সেদিন বিকালেও হেসেছে। তাও খুব সামান্য কারণে, একটা ছাগলের ছা লাফাতে গিয়ে দড়িতে বেঁধে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে, তাতেই সে কী হাসি! শেষ পর্যন্ত পাগল বলে সকলে এক প্রকারে মেনে নেয়। সুবহানের বাবারও মানতে অসুবিধা হয়নি। আশপাশে কেউ পাগল বলে ডাকলেই দাঁত কেলিয়ে উত্তর নিত। আর পাগল বলেই কিনা দুজনের কাজ করে অর্ধেক মজুরি পেত। সেই থেকে সুবহানের ধারণা হাসাটা ওদের অসুখ। মেয়েকেও সেই অসুখে পেয়েছে দেখে সুবহানের কষ্ট হয়। আবার ভাবে জেতার জন্যই তো হাসছে! বাপ তো হেসেই হেরেছে, আজ প্রথম ওরা জেতার জন্য হাসছে।

বিজ্ঞাপন বিরতির পর কৌতুক-পর্ব শুরু হয়েছে। প্রথমেই ব্যবসায়ী পরিবারের পুরুষ লোকটি কৌতুক-পর্বে বলল: ধর্ষণের দায়ে এক লোককে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত লোকটি পুলিশকে বলল, আমাকে কেনো গ্রেফতার করা হলো বুঝতে পারছি না, মেয়েটি তো একবারও বলেনি যে সে রেপ হয়েছে। পুলিশ রেগে গিয়ে বলল, বলেনি কারণ ও বোবা। লোকটি তখন উল্টো রাগ দেখিয়ে বলে, সেটা আমি কী করে বুঝব? মেয়েটি তো তখন একবারও বলেনি যে, সে বোবা!

ব্যবসায়ীর এই কৌতুক শুনে সরকারি চাকরিজীবী পরিবার হো হো করে হেসে উঠল। কৌতুকটা ঠিক মতো বোঝেনি সুবহান ও লতা। ওরা শুধু বুঝেছে কৌতুকটা রেপ নিয়ে। রেপের কথা মনে হতেই ওদের মুখটা ভার হয়ে ওঠে। কিন্তু এই খেলায় মুখ ভার হলেই পয়েন্ট কাটা। জিততে হলে ওদের হাসতে হবে। বোঝা না বোঝা বিষয় না। সুবহান ভেবেছে আমরা পাগলের জাত, হাসলে অসুবিধা কোথায়! সুবহান পাল্লা দিয়ে হেসেছে। মেয়েটার জরায়ুর ঘা এখনো শুকায়নি। তাও যা হেসেছে তা কল্পনার বাইরে।

এরপর সরকারি চাকরিজীবীর পালা। তিনি বললেন: এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে দেখলেন, রাস্তার পাশে একটা লোক তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘাস খাচ্ছে। ভদ্রলোক গাড়ির কাঁচ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী করো তোমরা? ওরা বলল, স্যার আমরা তিন দিন ধরে কিছু খায়নি। তাই ঘাস খাচ্ছি। ভদ্রলোক বলল, ঠিক আছে, আমার গাড়িতে উঠে আসো। রাস্তার ওসব নোংরা ঘাস খেলে পেট খারাপ করবে। লোকটি আনন্দে তার মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় বলল, স্যার আমার বউও তিন দিন ধরে কিছু খাইনি। ওকেও ডাকি? ভদ্রলোক খুশি মনে বলল, ডাকো। ওরা তিনজন আনন্দে ভদ্রলোকের গাড়িতে উঠে বসল। বলল, স্যার আপনি ফেরেশতা! ভদ্রলোকের বিশাল বড় বাড়ির ভেতর গাড়িটি থামল। ওরা নামল। ওদের মুখে হাসি। এত বড়োলোকের বাড়ির খাবার ওরা আগে কখনো খায়নি। ভদ্রলোক বাড়ির পেছনে বড় বড় ঘাস দেখিয়ে বলল, অনেকদিন কাটা হয়নি। যাও। পরিষ্কার আছে।

শুনে সকলে হাসিতে ফেটে পড়ল। সুবহান হাসতে হাসতে জান বের করে ফেলেছে।

এবার সুবহানের পালা। সে বলল: এক বড়লোকের ছেলে তার বন্ধুকে বলছে, জানিস আজ ম্যানিব্যাগ আর ফোনটা রাস্তার এক ছোকরাকে দিয়ে দিলাম। খুব শান্তি শান্তি লাগছে। সেই বন্ধু তখন বিস্মিত হয়ে বলল, তুই তো এক টাকাও দেওয়ার মানুষ না; দিলি কেন? বড়লোকের ছেলে তখন বলে, ঐ কিছু না, চাকুটা চকচক করছিল, দিয়ে দিলাম! এখন খুব আনন্দ লাগছে। বন্ধু তখন জানতে চায়, এতে আনন্দ পাওয়ার কি আছে? বড়লোকের ছেলে তখন হাতের আইফোনটা নাচাতে নাচাতে বলে, আছে বন্ধু, আছে!— তুই তো জানোস, এই থানায় আমার আঙ্কেল আছে। বলে দিয়েছি, দশ হাজার টাকাসহ ম্যানিব্যাগ আর আইফোনটা গেছে! এখন ছিনতাইকারী ব্যাটা খালি ম্যানিবাগ আর সস্তা ফোন নেওয়ার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাবে!

সুবহান শেষ করতে না করতেই হাসতে শুরু করে দেয়। মেয়ে লতাও সময় নেয় না যোগ দিতে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও হাসতে থাকে পাল্লা দিয়ে। এতটা সময় ধরে হাসার পর সকলেই কিছুটা ক্লান্ত। কিন্তু সেই ক্লান্তি প্রকাশ করার সময় এটা না। সকলে সেটা বোঝে, বোঝে বলেই হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় কারো কারো। সুবহান তো একবার চেয়ার থেকে পড়েই গেল।

তিন পর্বই শেষ। এখন ফলাফলের পালা।

শুধু হাসলে হয় না বুঝলি, ঢঙ জানা লাগে। বাড়ি ফেরার সময় সুবহান ওর মেয়েকে বলে।

মেয়েটা তখন বুদ্ধি করে উত্তর দেয়, আজ আমাদের টিভিতে অনেক লোক দেখছে, তাই না আব্বা?

হুম, আমাদের হাসতে দেখছে! বলে সুবহান মুখটা ভার করে। এখন আর মুখ ভার করে থাকলে কেউ নম্বর কাটতে যাবে না।

'ঈদ লাফটার শো' শীর্ষক এই গল্পটা নির্বাচিত হলো চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার জন্য। 'লাইট-ন্যায়ের আলো প্রেজেন্ট জীবনের গল্প' শীর্ষক প্রতিযোগিতায় গল্পটি জমা দিয়েছিল মইদুল। 'দৈনিক ন্যায়ের আলো' আর আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থা 'লাইট' যৌথভাবে পুরস্কারটি দিচ্ছে। অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা। গল্পের প্রধান চরিত্র হতে হবে দরিদ্র অসহায় মানুষ।

জীবনমরণ সংকট থাকতে হবে। সমাজের অসংগতি ফুটে উঠবে তবে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিদ্বেষমূলক কোনো বক্তব্য থাকবে না। অবহেলিত বঞ্চিত জনমানুষের কথা উঠে আসবে কিন্তু কারো অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া যাবে না। এরকম কিছু শর্ত বিজ্ঞপ্তিতে আগে থেকেই উল্লেখ করা ছিল। মইদুল প্রতিটা পয়েন্ট মাথায় রেখে গল্পটি লেখে। ওর টাকাটার খুব দরকার। স্ত্রীর ওভারিতে বড়সড় টিউমার হয়েছে। অনেকদিন থেকে ভুগছে। পরিবারে ক্যান্সারের হিস্ট্রি আছে। টাকার অভাবে অপারেশনটা করাতে পারছে না। ছেলেটা কানে খুব কম শোনে। ডাক্তার বলেছে, মাস দুয়েকের মধ্যে হিয়ারিং এইড না দিলে যা শুনছে তাও শুনবে না। এজন্য কম করে হলেও ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা প্রয়োজন। একটা পত্রিকায় চাকরি করে মইদুল। বেতন কোনো মাসে হয়, কোনো মাসে হয় না।

মইদুলের গল্পের সঙ্গে আরেকটা গল্প টিকে আছে প্রতিযোগিতায়। 'বিনিময়' শীর্ষক এই গল্পের প্রেক্ষাপট মেক্সিকো-আমেরিকা বর্ডার। একটা সিরীয় পরিবার মেক্সিকো সীমান্ত হয়ে চোরাপথে আমেরিকায় প্রবেশ করবে। দালালদের সঙ্গে দরকষাকষি হচ্ছে। মেয়েটাকে রেখে গেলে তিনজন প্রবেশ করতে পারবে। ছেলেটাকে রেখে গেলে দুজন। পরিবারটির মোট সদস্য চারজন। বাবা-মা, বারো বছরের এক মেয়ে আর নয় বছর বয়সী ছেলেটা। মায়ের বয়স হয়েছে, তার কোনো বিনিময় মূল্য নেই এই মানব পাচারের বাজারে। অবশ্য পর্যাপ্ত টাকা থাকলে কাউকেই রেখে যেতে হতো না।

পরিবারটি চুপ করে বসে থাকে। ওরা কাঁদতে ভুলে গেছে সেই কবেই। এখন ওরা যোগ-বিয়োগের হিসাব কষে। গেল বছর মার্কিন সৈন্যদের ভুল টার্গেটে বোমাটা পড়ল ওদের ঘরে, ভবনটা ধসে পড়ল। বৃদ্ধ বাবা-মা আর বড় ছেলেটা মরল। আট জনে বেঁচে থাকল পাঁচ। কদিন পর আইএস এসে ধরে নিয়ে গেল বড় মেয়েটাকে। পরিবারকে রক্ষা করার জন্য নগদ কিছু অর্থ নিয়ে বাবা নিজেই তুলে দিয়েছে ওদের হাতে। পরিবারে আরো একজন কমলো। এই হলো পরিবারটির সর্বশেষ হিসাব। এর আগে বংশের কতজন যে গেছে তার কি আর হিসাব করার সময় পেয়েছে কখনো! আর যাতে না কমে তা ভেবেই এতটা পথ অর্ধাহারে অনাহারে পাড়ি দিয়েছে ওরা।

দালালকে সঙ্গে নিয়ে দোভাষী আসে, বলে, আঠার ঘণ্টা হয়ে গেল, আর কত সময় নেবে? এরপর তো তোমরা না খেতে পেয়ে এখানেই মরবে। এখনই সিদ্ধান্ত না নিলে পরের চালানের জন্য ফের আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বলো কী করবে?

সিদ্ধান্ত ওরা আগেই নিয়েছে, কিন্তু যাকে রেখে যাবে তার সঙ্গে আরো কিছুটা সময় কাটাতে চাচ্ছে। অবশেষে পরিবারটি ছেলেসহ আমেরিকার পথ ধরে। মা কেবল বিড়বিড় করে বলে, আয়েশা যদি ফিরে আসে। পালিয়ে আসে বাড়িতে। আয়েশা ওদের বড় মেয়ে। ছোট মেয়েটার কথা যাতে আর না মনে পড়ে এজন্য মা তখন আয়েশা আয়েশা করে বিলাপ করে।

আমরা কাউকে রেখে যাচ্ছি না। ওরা এখন মৃত। বাবা বলে।

আমরা আমাদের মেয়েদের হত্যা করে পালিয়ে যাচ্ছি। মা বলে।

আমরা কাউকে হত্যা করিনি। ওদের জন্মই হয়েছে এভাবে ঝরে পড়ার জন্য। আমরা কেবল ওদের জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। ওরা আর বেঁচে নেই।

আমার মেয়েদের আত্মা খেলা করছে স্বর্গে। মা বলে।

পানি খাবো। পানি খাবো। ছেলেটি বলে।

সামান্য পানি দিয়ে মাইলের পর মাইল মরুভূমির মতো খাঁখাঁ প্রান্তর হেঁটে পাড়ি দিতে হবে। পথে কেউ কাউকে সাহায্য করতে আসবে না।

এখনো অনেক পথ যেতে হবে। আরেকটু পরেই দিচ্ছি। বাবা ছেলেকে বলে।

হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে যায়। বাবা পিঠে তোলে। মা চাদর দিয়ে বেঁধে দেয়। ছেলেটি ঘুমিয়ে যায় বাবার পিঠে। বাবা হাঁটতে থাকে শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে। হাঁটতে হাঁটতে মানিয়ে নেয় অতিরিক্ত ভারটুকু—মনে হয় শরীরের এই ভার তার আজন্ম।

আমেরিকার সীমান্ত দেখা যাচ্ছে। বাবা নির্বিকার কণ্ঠে বলে।

যারা ঘর উজাড় করল, তাদের কাছেই ঘর ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে। হায় খোদা! মা কাঁদে।

আমেরিকায় পা রাখার আগে শেষ বারের মতো জিরিয়ে নিচ্ছে ওরা। মাটির নিচ দিয়ে তৈরি করা সুড়ঙ্গপথ ধরে আরো কিছুটা হাঁটতে হবে। ক্লান্ত বাবা ছেলেকে পিঠ থেকে নামিয়ে মুখে পানি দিতে গিয়ে দেখে, ছেলে তখনও ঘুমিয়ে। ঘুম আর ভাঙে না।

মোটামুটি এই হলো দ্বিতীয় গল্পের প্লট। বিচারকরা বসে আছেন দুটি গল্প নিয়ে। যে কোনো একটির নাম আগামীকাল রাতে সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা করা হবে।

বিচারক কমিটির প্যানেলে সম্মানিত সদস্য আছেন চারজন— দুজন খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক, একজন এনজিও লাইটের নির্বাহী পরিচালক, অন্যজন দৈনিক ন্যায়ের আলোর সম্পাদক। পুরস্কার কমিটিরি সভাপতি দেশের খ্যাতিমান জাতীয় বুদ্ধিজীবী।

দ্বিতীয় গল্পের পক্ষে সম্পাদক সাহেব ভোট দিলেন। দুজন কথাসাহিত্যিক তখন নাশতার প্যাকেট থেকে কিছুক্ষণের জন্য মনোযোগ সরিয়ে মৃদু সম্মতি জানালেন। সভাপতি মহোদয় গম্ভীর হয়ে শুনছিলেন। এনজিওর নির্বাহী কর্তা তখন আপত্তি তুললেন। বললেন, এই গল্পে আমেরিকাকে নেতিবাচকভাবে দেখানো হয়েছে। আমাদের ফান্ডিং যেহেতু আমেরিকা থেকে হয়, তাই এ ধরনের গল্পকে আমরা পুরস্কৃত করতে পারি না। তাছাড়া গল্পে আইএস-এর প্রসঙ্গ আছে, কারো কোনো ধর্মীয় সেন্টিমেন্টে যাতে আঘাত না লাগে, সেটিও আমাদের ভাবতে হবে। তাই দ্বিতীয় গল্পটি আমাদের জন্য উপযুক্ত হবে। এনজিও কর্মকর্তার এ বক্তব্যেও দুজন কথাসাহিত্যিক মৃদু সম্মতি জানিয়ে আপেলে কামড় বসালেন। নিরুত্তর বসে আছেন কমিটির শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি।

কিন্তু দ্বিতীয় গল্পকে পুরস্কৃত করলে মিডিয়া কভারেজ বেশি পাওয়া যাবে। লেখক কর্পোরেট জগতে খুব প্রভাবশালী মানুষ। কিছু বড়ো অঙ্কের বিজ্ঞাপনও পেতে পারি। পুরস্কারটির সূচনা পর্বে সেটিও আমাদের মাথায় রাখার মতো বিষয়। সম্পাদক তার সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করলেন।

আমাদের মতো নতুন এনজিওর জন্য মিডিয়া কভারেজ অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে আইএস আর আমেরিকার বাড়ি উড়ানোর বিষয়টি গল্প থেকে বাদ দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। লেখক কি রাজি হবেন? এনজিও কর্মকর্তা এ কথা বলে দুজন কথাসাহিত্যিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

দুদিন আগেই তো একটা অনুষ্ঠানে বললেন, লেখালেখির জন্য কোনো কম্প্রোমাইজ তিনি জীবনে করেননি। পুরস্কার-সম্মাননা যা এসেছে নিজে

থেকে এসেছে, তিনি বরঞ্চ এসব থেকে দূরেই থাকতে চেয়েছেন সব সময়। একজন কথাসাহিত্যিক বললেন।

আমার বন্ধু মানুষ, আমি বলে দেখতে পারি। অপর কথাসাহিত্যিক বললেন।

ঠিক আছে, তোমরা দুজন দায়িত্ব নাও। প্রস্তাবিত সংশোধনে তিনি রাজি না হলে সর্ব-সম্মতিতে প্রথম গল্পকেই পুরস্কৃত করা হবে। গোপনীয়তা যাতে রক্ষা থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সভাপতি মহোদয় এ কথার মধ্য দিয়ে 'লাইট-ন্যায়ের আলো প্রেজেন্টস জীবনের গল্প' শীর্ষক পুরস্কার প্রদান কমিটির চূড়ান্ত সভার সমাপনী ঘোষণা করলেন।

দ্বিতীয় গল্পের লেখক ড. হাসান শাহেদ। একটি প্রাইভেট ব্যাংকের এমডি। ছেলেটা আমেরিকায় পড়াশুনা শেষ করে ওখানেই চাকরি নিয়েছে। মেয়েটা গাইনির ডাক্তার। ঢাকার একটি বড়ো হাসপাতালে বসে। হাসান শাহেদের রেফারেন্স ধরে মইদুল গিয়েছিলেন বউকে নিয়ে। বলেছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছাড়ে অপারেশনটা করে দেবে। কিন্তু ওটি চার্জ থেকে শুরু করে হাসপাতালের অন্যান্য বিল ওখানে এত বেশি যে তাতেও শহরের গড়পড়তা ক্লিনিকের চেয়ে কম আসবে না। পুরস্কারের ঘোষণার জন্য এই কারণে অপেক্ষা করছেন মইদুল। অপেক্ষা হাসান শাহেদেরও আছে। তিনি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন পুরস্কারটা পেলে সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে লেখক-বন্ধুদের নিয়ে পার্টি দেবেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে।

মইদুলকে দুপুরের দিকে ফোন করেন হাসান শাহেদ। ফোনটি ধরার আগে মইদুলের চোখেমুখে আশার আলো খেলে যায়। ভাবছিলেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে অপারেশন করার যে অনুরোধ তিনি করেছেন সেটা বোধহয় রেখেছে ডাক্তার-মেয়ে। মইদুল হ্যালো বলতেই, হাসান শাহেদ হাসতে হাসতে বলেন, পান আর হই-হল্লা করব। পরশু রাতে কন্টিনেন্টালে চলে আসেন। আপনি আজকাল যা লিখছেন, আপনার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ধন্য হব।

বঙ্গবন্ধুকে চিঠি

করিম চাচা ফিরে এলেন ১০ জানুয়ারি। আমরা তখন বেতারে কান দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর শুনছি। দুপুরে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এলেন। করিম চাচা কখন গ্রামে এসেছেন আমরা জানি না। সন্ধ্যায় কেউ একজন টের পেল গ্রামের শেষ বাড়িটায় হারিকেন জ্বলেছে। গ্রাম বলতে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে শ খানেক বাড়ি হবে। এমনিতেই ঘরের দেয়াল ওঠে তো ছন খসে যায়, মেঝে ঠিক করতে করতে টিন উড়ে যায় দমকা বাতাসে, তার ওপর ন মাসের যুদ্ধে গাঁটার হতচ্ছাড়া অবস্থা। কে কার বাড়ি দেখে! ফলে আমরা আর সেই সন্ধ্যায় হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলোটুকুর খোঁজ নিতে যাই না। পরদিন সকালেও ভুলে যাই গ্রামের শেষ বাড়িটায় বহুদিন পর আলো জ্বলে ওঠার কথা। আমাদের স্কুল নেই, লেখাপড়া নেই, একবেলা যে দুটো ভাত জোটে তাই পেটে ফেলে মাঠময় ছুটে বেড়াই। কদিন আগেও এ মাঠে দৌড়ানো তো দূরের কথা হাঁটতেও পারিনি। পা টিপে টিপে রাতের অন্ধকারে বদনা হাতে যেটুকু না গেলেই না। ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান আর্মির পুতে রাখা মাইনগুলো তুলে ফেলার পর এখন আমরা প্রাণখুলে ছুটতে পারি। তখন মাইন পোঁতা থাকলেও আজ মনে হয় সমস্যা ওখানে ছিল না, আমাদের পা-জোড়াই যেন বাঁধা ছিল, আমরা জন্মেছি পা বাঁধা অবস্থাতেই; কিন্তু হঠাৎ কোনো এক জাদুকর এসে খুলে দিয়েছে শিকল। ফের যাতে কেউ না বেঁধে ফেলতে পারে এই ভয়ে আমাদের ছোটাতে কোনো ক্লান্তি আসে না।

পশ্চিমে দম বন্ধ করে পাঁচ মিনিট দৌড়ালে ভারতের সীমান্ত। সীমান্তের পাশে প্রবহমান খালের ওপর পেটে পেট, পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে ছন্নছাড়া এই গ্রামটা। বছর বছর খালটির

খামখেয়ালি চলনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে গ্রামটির ভূগোল। দুপুরুষ আগের কেউ কেউ বলে গেছেন খালের ওপারেই ছিল বসতি। পানির সঙ্গে গড়াতে গড়াতে দেশটাই বদলে গেছে। এখন ওপর থেকে দেখলে মনে হবে, কচি হাতে আঁকা একটি নদী-গ্রাম। সাপের মতো মেরুদণ্ডহীন লিকলিকে দেহ নিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে, গ্রামটিও অতি উৎসাহের সাথে বাঁকে বাঁক মিলিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে পিছটান মেরেছে। উত্তর-দক্ষিণে নিরন্তর মাঠ। যতদূর চোখ যায় ধানি জমি। পুবে মেহেরপুর শহর।

আমরা যখন দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে করিম চাচার উঠোনে বসে ছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা এই ঘরে বহুদিন পর আলো জ্বলতে দেখেছি। আমাদের মনে পড়ে যাওয়ার আগেই করিম চাচা ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক লোকটি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন দেশ স্বাধীন হওয়ার চব্বিশ দিন পরে। ১ ডিসেম্বর থেকে মেহেরপুর মুক্ত হতে শুরু হলেও সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীর পুঁতে রাখা অসংখ্য মাইন অপসারণের পর ৬ ডিসেম্বর এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে হানাদারমুক্ত হয়। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার আগেই আমাদের গ্রাম থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন, তারা ফিরে আসেন। যারা আসেননি তাদের আমরা শহিদ বলে ধরে নিই। যখন যিনি এসেছেন আমরা ছুটে গেছি তার কাছে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে। যুদ্ধের সময় সীমান্তের ওপারে শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়ার কারণে মুক্তিযুদ্ধের দুঃসাহসিক অভিযানের অনেক কথাই আমাদের তখন অজানা। একজন একজন করে ফেরার সংবাদ আসে আর আমরা ছুটে যাই। তাদের বাড়ির সামনে বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুদ্ধের গল্প শুনবো বলে। শিহরন জাগানো সে সব কাহিনি আমরা শুনি আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি যুদ্ধফেরত সৈনিকের দিকে। কদিন আগেও আমরা যাকে মামা-ভাই-চাচা-বোন বলে ডেকেছি তাদের খুব অচেনা মনে হয় তখন। মনে হয় যেন সিনেমায় আমরা গল্প শুনছি কোনো নায়কের। শ্রোতা হিসেবে আমরাও তখন সেই সিনেমার চরিত্র হয়ে উঠতে পেরে গর্ববোধ করি।

কিন্তু আজ যখন যুদ্ধফেরত বৃদ্ধসৈনিক করিম চাচাকে দেখি তখন আর আমরা ছুটে যাই না। তাকে কোনো সিনেমার নায়ক ভেবে শিহরিত হই না। যুদ্ধ থেকে মাত্র কটা দিন দেরি করে ফেরাতে আমাদের সব গল্প

যেন শেষ হয়ে যায়। করিম চাচা আমাদের ডাকেন—একদিন না, প্রায়ই। যখনই কাছে-দূরে দেখেন, ইশারা করেন। আমরা কখনো যাই, কখনো যাই না। তিনি তার যুদ্ধদিনের গল্পগুলো বলেন, আমরা কখনো শুনি, কখনো শুনি না। করিম চাচার সব গল্পই আমাদের শোনা মনে হয়। চাচা মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়া-দিনাজপুর অঞ্চলে বিভিন্ন ক্যাম্পে ছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনী মেহেরপুরে প্রবেশ করে ১৮ই এপ্রিল। করিম চাচা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলে রান্না করতেন। ওখান থেকেই যুদ্ধে চলে গেছেন তার আগেই। বিভিন্ন ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে দিতেন বলে জেনেছি। যার হাতে অস্ত্র ছিল না, তার গল্প আমাদের তখন টানে না। আমরা পালিয়ে বেড়াই করিম চাচার গল্প থেকে।

কিন্তু একটা গল্প কতগুলো মানুষকে ঠিকই টেনে নেয় তার কাছে।

১৯৭২ সালের ১২ জানয়ারি বঙ্গবন্ধু সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি যেদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা—এ সকল বিশ্বাসের কথা বললেন, ঠিক সেদিনই গ্রামে ফিরে এলেন মতুবিল্লাহ হুজুর দিনের নতুন দাওয়াত নিয়ে। সঙ্গে কজন অচেনা যুবক। রাতারাতি সহী হাদিসের কথা শুনিয়ে গ্রামের প্রভাবশালী মানুষগুলোকে আহলে হাদিসে রূপান্তর করে নিলেন। আমার যুদ্ধফেরত বাবাও গেলেন সে দলে সহী দিনের কথা ভেবে। আমরা গেলাম মতুবিল্লাহর কাছে, মুক্তিযুদ্ধের মুখোরচর গল্প শুনতে। পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে রাতদিন থেকে তিনি কীভাবে দেশের উপকার করেছেন তার ব্যাখ্যা দিতে উদ্ভট সব দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শোনাতেন আমাদের। আমরা গ্রামের অল্পবয়সিরা মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাসের ছাত্র হয়ে উঠেছিলাম রাতারাতি।

করিম চাচার কাছে তখনও কেউ যায়নি। বয়সের ভারে তিনি যখন ন্যুজপ্রায়, যে গল্প না বলতে বলতে মরচে পড়েছে তখনই সেই গল্পের সূত্র ধরে কয়েকঘর মানুষ গিয়ে দাঁড়ায় তার উঠোনে এক আকাশ অন্ধকার পেছনে ফেলে। সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে কটা ঘর। মালোপাড়া পুড়ে শেষ। মতুবিল্লাহর নির্দেশে মুখোশধারীরা আগুন দিয়েছে। মালোদের দেশ এটা না, ওদের ওপারে চলে যেতে হবে। সহী মুসলমানদের গ্রামে ওরা থাকলে আল্লাহর রহমত আসবে না, মানুষজন দ্বিন ভুলে কাফেরদের অনুসরণ করবে, এক জুমার খুতবায় এমনটাই বললেন মুতুবিল্লাহ হুজুর।

সেই ঘরপোড়া মানুষগুলো দাঁড়িয়েছে করিম চাচার উঠোনে হারিয়ে যাওয়া একটা গল্প নিয়ে। তারা তখন মনে করিয়ে দেয়, যে গল্প আমাদের মনে ছিল না, যে গল্প না বলতে বলতে ভুলে গেছেন গল্পকার স্বয়ং। তারা রাতের অন্ধকারে উন্মোচন করে অন্য এক সত্যের।

এক বুক আশা নিয়ে মালোপাড়ার লোকজন করিম চাচাকে বলে, চাচা একখান পত্র লিখবা তোমার ছেলেকে? হেই এখন মা-বাপ আমাদের। ঘরবাড়ি কিছুই থাকল না। বাপদাদার দ্যাশটা থাকব না?

আমরা তখন করিম চাচার সন্তানের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করি। আমরা যখন ভাবতে ভাবতে হয়রান হয়ে পড়ি তখনই আমাদের মনে পড়ে করিম চাচার নিঃসন্তান স্ত্রীর কথা। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য একাত্তরে কোনো এক মধ্যদুপুরে মতুবিল্লাহ লোকজনসহ তাকে তুলে নিয়ে যায় পাকিস্তানি ক্যাম্পে। ওমন বুড়ো মানুষকে ক্যাম্পে নিয়ে কি করবে সেটা নিয়ে আমরা তখন বিস্ময় প্রকাশ করেছি, কারণ আমরা অতি অল্পবয়সেই জেনে গিয়েছিলাম ক্যাম্পে নারীদের নিয়ে কী কী করা হয়। আমরা বুঝে গিয়েছিলাম শুকনো শরীরের এক বৃদ্ধনারীকে ওসবে প্রয়োজন হবে না। কিন্তু আমাদের সব জানা ঠিক ছিল না। করিম চাচার সন্তানের সন্ধানে গিয়ে আমাদের সে কথা আজ মনে পড়ে। মালোপাড়ার লোকজন তখন করিম চাচাকে মনে করিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুর কথা। দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা। আমাদের বড়রা তখন মনে করতে পারে চাচা কয়েক বছর আগে গ্রামে এলে এক তরুণ নেতার গল্প শোনাতেন। নেতাকে চাচা বাজান বলে ডাকতেন, নেতাও চাচাকে প্রত্যুত্তর দিতেন চাচাজান ডেকে। এই গ্রামে একটাই গল্প ছিল তখনকার ছেলেবুড়োদের জন্য। করিম চাচা মাঝে মধ্যে এসে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সেই নেতার গল্প শুনিয়ে চলে যেতেন। বলতেন, আমার ছেলে এক মহান নেতা। ও একদিন গরিবের মুখে হাসি ফুটাব। এসএম হলের সেই নেতা আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। মালোপাড়ার ঘরগুলো ছাঁই করে আগুন যখন শান্ত হয় তখন এই গল্পটা বাতাসে ফুঁসে ওঠে।

লিখব যা। করিম চাচা বলেন। মালোপাড়ার লোকগুলো কেউ কেউ বুকে আশা বেঁধে পড়ে থাকে, কেউ কেউ সরে যায় সীমান্তের ওপাশে। খালের এপার-ওপার হয় ওদের জীবন। মাত্র ক'কদম দূরত্বে ওদের আত্মপরিচয় বদলে গিয়ে নতুন কোনো আত্মপরিচয় তৈরি হয় না। ওরা পড়ে থাকে নো-ম্যানস ল্যান্ডে।

করিম চাচা লিখব লিখব করে কিছুই যখন লেখেন না তখনই আবার নতুন কথা লেখার আবদার নিয়ে হাজির হন জনা দশেক বাউল। দক্ষিণ মাঠের মধ্যকার আখড়াটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাউল সুফিদের কাজকারবার শরিয়া-পরিপন্থি। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া বাউলদের অঞ্চল। এই নাপাকি অঞ্চলকে পাক করতে হবে বলে বলে গ্রামের মানুষকে আহ্বান জানালেন মতুবিল্লাহ হুজুর। বাউলরা ভিটেছাড়া হয়ে দাঁড়ালেন করিম চাচার উঠোনে। পত্র একটা লিখতে হবে পুত্রকে, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে। করিম চাচা এমনই বৃদ্ধ যে কোনো কিছুকেই না বলার সামর্থ খুঁজে পান না। তিনি লিখবেন বলে চুপ করে বসে থাকেন উঠোনে। ওপাশে একটা মাথাভাঙা পেঁপেগাছ, এপাশে চাচা। কোনো দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসে না। উপস্থিত লোকজনও আর কোনো কথা বাড়ায় না। আমরা পায়ের কাছে বসে থাকি একটা গল্প শুনবো বলে, এসএম হলের সেই পুরানো গল্পটা। গল্পগুলো না শুনতে শুনতে জমে গেছে চাচার শুকনো চোখের কোটরে। আমরা পড়ে নিতে পারি আবার পারি না। আমরা ফের যাই।

করিম চাচা, এসএম হলের গল্পটা মনে পড়ে?

করিম চাচা কোনো উত্তর দেন না।

সেই তরুণ নেতার কথা মনে পড়ে?

চাচা কোনো উত্তর দেন না।

লিখবে নাকি প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের কথা?

চাচা কোনো উত্তর দেন না।

আমরা ফিরে আসি বসে থেকে থেকে।

করিম চাচার কাছে ফের যাই দলেদলে। অন্য গল্পের সাক্ষী হয়ে। কতকগুলো ঘোমটা দেওয়া মেয়েমানুষ গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উঠোনে। কতকগুলো অচেনা পুরুষমানুষ আসে ভিনগাঁ থেকে। একটা শুকনো হাড্ডিসার শরীর এসে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়, নারী না পুরুষ বোঝা যায় না। পত্র লিখতে হবে বঙ্গবন্ধুকে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে।

করিম চাচা আজ সকাল সকাল ওঠেন। আমরা বসে থাকি উঠোনজুড়ে। তখনও সূর্যের আলোটা তেতে ওঠেনি। তিনি এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে বের হয়ে আসেন ঘর থেকে। একগুচ্ছ কাগজের ভার সহ্য

করার মতো বয়সটাও তার আর নেই। তিনি উঠোনে বসে কাগজগুলো দড়ি দিয়ে বাঁধেন। আমরা উঠে দাঁড়াই পাশে। ছোটোবড়ো অক্ষরে, কোথাও কোথাও কলমের নিব ছুঁয়ে যায়নি, সমস্ত কাগজ লেখা। কিছু বুঝতে পারি, কিছু পারি না। আমরা হাত লাগাই বাঁধার কাজে। কোনো একটা কাগজ ছুটে গেলে আমাদের কথা বাদ পড়ে যাবে ভেবে সাবধানী হই। সবগুলো কাগজ বাঁধা হলে করিম চাচা অনেক কষ্ট করে বলেন, পোস্ট অফিসে ফেলে দিয়ে আয়। এমন করে গুনে গুনে বলেন শব্দগুলো যেন প্রতিটা শব্দ টাকা দিয়ে কেনা তার।

ঠিকানা কই চাচা? আমরা বলি।

চাচা তখন ভেতর যান, কচ্ছপের গতিতে তার চলা আমাদের ধৈর্য্যহীন করে তোলে। আমরা আবার বলি, ঠিকানা কই চাচা?

কলমটা হাতে নিয়ে চাচা আসেন। একটা সাদা কাগজে বানান করে করে লেখেন :

প্রেরক
করিম চাচা
খালপাড়া, মেহেরপুর

প্রাপক
মুজিব বাজান
প্রধানমন্ত্রী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

তারিখটা দেবে না চাচা? আমাদের পেছন থেকে কেউ একজন মনে করিয়ে দেয়।

চাচা কাগজের ডান দিকে উপরে বড় বড় করে লেখেন :
১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে ছুট দিই পোস্ট অফিসের দিকে। চিঠিটা ঠিকমতো পৌছাতে হবে বঙ্গবন্ধুকে।

যে জীবন ফুটবলের

ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে কবে, ফের কবে শুরু হবে এসবের খোঁজখবর এ পাড়াতে আসে না। উঠতি বয়সী ছেলেরা যারা নানা কারণে বয়স হওয়ার আগেই উঠতি বলে চিহ্নিত হয়েছে, কিছু একটা পেলেই তাদের মেতে ওঠা স্বভাব। যেমন ফুটবল যে ফুটবল ছাড়াই খেলা যায় সেটা এদের চেয়ে আর কেউ বেশি বোঝে না। লাথি মারার কিছু একটা পেলেই তারা ছাড়ে না। ফাটাছেঁড়া বল, কাপড়ের পুঁটলি, ময়লার জটলা এমনকি পাথরের মতো শক্ত কোনো বস্তু—এত তৃপ্তি করে লাথি মারে সকাল-সন্ধ্যা—মনে হয় যেন জগৎকে লাথি মারার জন্যই এদের জন্ম হয়েছে; অথচ এরা কেউ চিহ্নিত ফুটবলার নয়। এরা যে গোল গোল খেলে সেটা ফুটবল বলে স্বীকৃতি দেয় না কেউ। যে দু-একজন ছেলের বাপ আছে, কাজ থেকে ঘরে ফিরে মার কাছে যদি জানতে চায় ছেলে কোথায়, যদিও তারা কালেভদ্রে সেটা জানতে চায়, অনেক সময় উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করে না, অপেক্ষা যেদিন করে সেদিন আবার বউয়ের কাছ থেকে কোনো উত্তর আসে না, যেদিন অপেক্ষা করে না সেদিন হয়তো বউটা মুখ ফসকে বলে ফেলে, 'ওই অপয়ার খোঁজ কে রাখে! দেখো-গে কারও পোদে কাঠি দিচ্ছে!' ফলে ফুটবল খেলার বিষয়টি এভাবে অতি তাচ্ছিল্যে চাপা পড়ে যায়। মজিদ যখন বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ায় রাতের কোনো এক সময় এবং ওর বাপ যদি কোনো দিন জিজ্ঞাসা করে বসে, 'ওই মাগির পুত, কই ছিলি?' মজিদ উত্তরে— অধিকাংশ দিন কিছুই বলে না, যেদিন বলে সেদিন খুব বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়— 'তোর বাপের হোগার বাল ফেলছিলাম!' মজিদ নিজেও স্বীকার করে না যে সে ফুটবল খেলছিল। এ নিয়ে ওর বাপ আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে না, করলেও মজিদ

না শুনে ঘরে ওঠে কিংবা ছুট দেয় অন্ধকারে। যেদিন ঘরে ওঠে সেদিন মায়ের কাছে কোনো নালিশ জমা থাকলে শোনায়। বলে, 'মরির মা বলল তুই নাকি ওগো পেয়ারা চুরি করছস।' 'হ, মরির মারে চুদি!' মজিদ উত্তর দেয়। এতে সে পেয়ারা চুরি করেছে, না করেনি পরিষ্কার হয় না। মজিদের মা তখন বলে, 'ডাঁসা ডাঁসা পেয়ারা; আমাকে একটা দিতি পারতিস।' মজিদ তখন আরও চটে গিয়ে বলে, 'মাগি পেয়ারা খাওয়ার জন্য চোর বলছে, বড় হই একদিন ওর ঝুলে যাওয়া বড় বড় তালদুটো কেটে ফুটবল খেলব। আমারে চেনেনি।' মজিদের কথায় ওর মার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। ছেলে বাপের মতো মিনমিনে হয়নি, বাঘের মতো তেজ পেয়েছে। এরপর মজিদের মা মনমরা হয়ে মজিদের বাপের কথা ভাবতে থাকে। আজও রাতে দুজন আসবে। ভুল করে সময়টা একই হয়ে গেছে। মজিদ যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হতো, তাহলে রাতটা ভাগাভাগি করতে পারত, কিন্তু ছেলে হয়ে অন্যরকম ভালো হয়েছে, এরকম একটা তেজি ছেলে তার দরকার ছিল। মজিদের মা ভাবে।

আজ মজিদরা দু দলে ভাগ হয়েছে। অন্যদিন কোনো দলটল থাকে না, গোল থাকে না, যে যার মতো লাথায়। কোনো গোলপোস্টের প্রয়োজন হয় না ওদের। আজ ওরা দু দিকে চারটি ইট খাড়া করে গোল তৈরি করেছে। দুজন দাঁড়িয়েছে দু দিকের গোলে। গোলকিপার নামেই, দুদলে চারজন করে আছে, আটজনই একসঙ্গে বলের পেছনে দৌড়াচ্ছে। গোল আছে বটে কিন্তু কেউ কোনো গোল করছে না, করলেও মনে রাখছে না। অথচ আজ যে দল হারবে তাদের চল্লিশ টাকা দিতে হবে। জনপ্রতি দশ টাকা।

আজ ওরা বলটা পেয়েছে ভালো, পেটাতেই আরাম লাগছে। বাজারের বল না হলেও এবড়ো-থেবড়ো কিছু না। শক্ত কিন্তু পাথর পেটানো পায়ে অতো লাগছেও না। একটা চটের বস্তার মধ্যে পেঁচানো, ওরা বুদ্ধি করে কিছু ছেঁড়া ত্যানা ভরে নিয়েছে, তারপর এমন করে ঠাস দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধেছে যে, ফুটবলের মতো গোল দেখাচ্ছে। ওরা খেলছে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের পেছনে।

ফুটবলের ভেতরের মূল বস্তুটা পেয়েছে প্রাচীরের ওপাশেই। বস্তার মধ্যে ছিল। লাল হয়ে ভিজে গেছে বস্তাটা। প্রথমে দেখেছিল মজিদই। কিন্তু বুদ্ধিটা দেয় মফে। তখন ওরা হাওয়াতে পা চালাচালি করছিল, অন্ধকারে মিছামিছি বল নিয়ে খেলার শিল্পটা ওদের রপ্ত আছে। এমন

সময়ই তলপেট হালকা করতে গিয়ে বস্তাটা মজিদের চোখে পড়ে। মজিদ এমন করে তুলে ধরে যে গোল ফুটবলের মতো মনে হয়। ভেতরটা একবার দেখে নিয়ে মফে বলে, 'হোক বাড়া, চল বল খেলি।' আর কেউ দ্বিতীয়বার ভাবেনি। পাশেই গার্মেন্টসের ফেলে দেওয়া কিছু ছিট কাপড় পড়ে ছিল পেঁচিয়ে, অর্ধেকটা বেরিয়ে অর্ধেকটা মাটির মধ্যে পুঁতে, ওরা টেনে তোলে, বস্তার ভেতরে ঠেসে দিয়ে বাঁধে। সেই থেকে লাথাচ্ছে।

ওরা আটজন বাদে আরও তিনজন আছে, দর্শকসারিতে থাকলেও মন তাদের খেলাতে নেয়। চোখ সেঁটে আছে বলে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভাবছে এরকম একটি বল পেলে ওরাও একদিন দেখিয়ে দেবে। ওদের তিনজনের মধ্যে সাদেক আর তোফা দু ভাই। পিঠাপিঠি না যমজ কেউ বলতে পারে না। বস্তিতে তাদের বাবা আছে, মা থাকলে বলতে পারত। আর আছে বয়স্ক দাদি। এত বয়স্ক যে, প্রতি রাতেই মনে হয় আজ তার শেষ রাত, কিন্তু কোনো রাতই তার শেষ রাত হয় না। সাদেক আর তোফা ধরে নিয়েছে তাদের দাদি আর কোনোদিনই মরবে না, আর দাদির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ওদের খাওয়াদাওয়া, থাকা আর ঘুমানোর অসুবিধা থেকেই যাবে। মজিদরা যখন খেলছিল তখন তোফার মনে অকারণেই ওর দাদির কথা মনে ভাসছিল। ভাবছিল আজ রাতেও বুড়ি মরার মতো কাশবে, ওর এপাশ ওপাশ করে নির্ঘুম রাতটা যাবে। একটা শান্তিময় ঘুমের খিদে ওদের পেটের খিদের চেয়ে কম জ্বালাতন করে না।

মজিদরা যখন খেলা শেষ করবে করবে করেও খেলা চালিয়ে যায়, তখনই মোড়ের দোকানে নিউজবাংলা টেলিভিশন দেখতে থাকা দর্শকরা জানতে পারেন, বুড়িগঙ্গার নর্দমায় একটা লাশ পাওয়া গেছে। মাথা না থাকার কারণে তখনও লাশটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। পুরোনো ঢাকার এক ব্যবসায়ী অপহরণ হয়েছে দিন পাঁচেক হলো, পরিবার মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে পারেনি, তার লাশ বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিখোঁজ আছেন সাভারের এক স্কুলমাস্টার, বখাটের হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দেননি বলে নিখোঁজ হয়েছেন তিনি, এটাও বাসি খবর, মাথাবিহীন লাশটা তারও হতে পারে। আর ঢাকার বাইরের হলে সম্ভাবনা আরও বাড়ে। বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতা নিখোঁজ আছেন বরিশালে, চট্টগ্রামে এক অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট, খুলনায় এক ডাক্তার—। মাথাবিহীন লাশটি এদের যে কোনো একজনের হতে পারে, কিংবা এর বাইরের কেউ যার খবর এখনো মিডিয়া জানে না অথবা জেনেও মনে রাখা উচিত মনে করেনি।

যারা নিউজ-অলটাইম দেখছিলেন তারা জানতে পারেন অন্য একটি লাশের খবর। সেটিও ভেসে উঠেছে, তবে নর্দমায় নয় নদীতে। যমুনা এখনো নর্দমা হতে বাকি। তবে এই দেহটি নারীর। ধারণা করা হচ্ছে কোনো বাসে ধর্ষণ করে মাথাটা কেটে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মাথাটা যেহেতু পাওয়া যায়নি সেহেতু লাশের পরিচয় নির্ণয় করা এখনই সম্ভব নয়। এরইমধ্যে চারটি মেয়ের নিখোঁজ সংবাদ জানাচ্ছে মিডিয়া। এর মধ্যে দুটি মেয়ের একটির বাড়ি কুষ্টিয়া, অন্যটির নাটোর, সেদিন রাতে ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ হয়ে বাড়ি ফিরছিল। একটা চাকরি করে গার্মেন্টসে, অন্যটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রী। আর দুজন নিখোঁজ আছে অন্য এলাকার, একজন কুমিল্লার, অন্যজন হবিগঞ্জ। যে মেয়েটির শরীর পাওয়া গেছে, সঙ্গে কোনো মাথা পাওয়া যায়নি, মৃত শরীরটা এই চারজনের একজন হতে পারে। মাথাবিহীন নগ্ন পুরুষের শরীর পরিবার যত সহজে চিনে নিতে পারে তত সহজে মাথাবিহীন নারীর নগ্ন শরীর চিনে নিতে পারে না। মাথাবিহীন নারীর নগ্ন শরীর পরিবারের কাছে খুবই অচেনা। মাথাবিহীন নগ্ন নারী লাশের পিতাও শতভাগ নিশ্চিত হয়ে পিতৃত্বের দাবি জানাতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক মৃত কন্যার নগ্ন শরীরের দিকে তাকানো কতটা নির্দোষ আমরা বলতে পারব না। এ লাশটিও আপাতত অনির্ণীত থেকে যায়। দুটো লাশ অপেক্ষা করে মর্গে, নিখোঁজ পরিবারগুলো অপেক্ষা করে মাথার।

ছেলেরা যখন বলটি আর চোখে দেখতে পায় না, অন্ধকারে মিলিয়ে যায় থেকে থেকে, তখনই খেলা ছাড়ে। ওরা এতক্ষণে টের পায় খিদেও লেগেছে। ঘরে ফিরতে হবে। কিন্তু বলটির কথা ওদের মনে হয়। সাদেক আর তোফা তখনও দাঁড়িয়ে বলটির শেষ ঠিকানা দেখার জন্য। ওরা কোনো একটি মুহূর্তের জন্য এমন একটি বলের মালিক হতে চায়। কিন্তু মজিদ বয়সে ছোটো হলেও বুদ্ধিতে পাকা। ও জানে এ বল সংগ্রহ করার মতো নয়। রাতের অন্ধকারেই ওদের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে হবে। মজিদ বলটা হাতে তোলে, একটু হাঁটলেই একটা প্রবহমান ড্রেন—বুড়িগঙ্গার পথে কিন্তু বুড়িগঙ্গার মতো নিশ্চল নয়।

সাদেক আর তোফা হতাশ হয়ে ফিরে আসে। তৃতীয় ছেলেটাও আসে। ওর কোনো নাম নেই, কারণ ও বোবা, কানে শোনে না। ফলে ইশারা করে ডাকতে হয়। সাদেক আর তোফার সঙ্গে সবসময় থাকে।

ওরা ফিরে যায়। সারাদিন আয় রোজগারের জন্য এটাসেটা করা তারপর সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত একটা বলের পেছনে ছোটোছুটি করে

ক্লান্ত হয়ে কেউ কেউ হয়তো ঘুমিয়েও পড়ে। ঘুম থেকে উঠে কিংবা অন্য কোনো দিন এমন কোনো বল পাবে কিনা এ নিয়ে ওরা চিন্তা করে না। ওদের চিন্তা পেট নিয়ে, জগতের আর কোনো কিছু নিয়ে ওদের চিন্তা করার দায় নেই।

কিন্তু ঘুমাতে পারে না সাদেক আর তোফা। একেই তো দাদির সেই পুরাতন কাশির শব্দ, একটু পরপর 'হামাক বাঁচা, হামাক বাঁচা' বলে চিৎকার করে কেঁদে ওঠা, তার সঙ্গে আজ যুক্ত হয়েছে একটা বল নিয়ে মজিদের দেখিয়ে দেখিয়ে খেলার জেদ। যেভাবে আজ ওরা ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে খেলেছে সেভাবে ওরা একদিন সকাল-সন্ধ্যা খেলতে চায়। ঘুম না আসা আর অন্যদিকে দাদির বেদম কাশি শুনে বুদ্ধি একটা ওদের মাথায় খেলে। বুদ্ধিটা প্রথমে আসে সাদেকের মাথায়, এরপর আসে তোফার মাথায়। ওরা কেউ কাউকে কিছু বলে না, একই সময় একই বুদ্ধি দুজনার মাথায় আসার বিষয়টি ওদের জন্য নতুন নয়।

ফজরের আজানের পর আকাশটা একটু ফর্সা হতেই ওরা দৌড় মারে, যে ছেলেটির নাম নেই, নাম ধরে ডাকলে শোনে না, তাকে বিছানা থেকে গুঁতিয়ে তোলে, দু ভাইয়ের তখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে আজ সারাদিন ওরা খেলবে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না, যে শোনার সে বোঝে ইশারা, তোফা উল্টোপাল্টা কী ইশারা করে, অর্ধঘুমের মধ্যেই ছেলেটি ধরে ফেলে। ওরা তিনজনে দৌড় দেয় শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের পেছনে। তিনজনে কীভাবে দু দল হওয়া যায় ওরা বোঝে না, ওরা শুধু বোঝে কোনোদিকে গোল না থাকলেও, সমানে সমানে বিভক্ত না হয়েও লাথি মারার জন্য গোলগাল কিছু একটা থাকলেই ভালো ফুটবল খেলা যায়।

খুনের সংবাদ ধরাতে

দৈনিক দেশের বাণীর মফস্বল এডিটর শফিক। প্রতিদিনের মতো আজও শত শত খবর এসেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। শিরোনাম দেখেই অর্ধেক খবর ফেলে দেয় মফস্বল ডেস্কের সাব-এডিটররা। খুন-ধর্ষণ-গুমের মতো গুরুতর ক্রাইমের খবর থেকেও কিছু ছাঁটা পড়ে। ১০ পৃষ্ঠার দৈনিক। এর মধ্যে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা এপিঠ-ওপিঠ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য। ইনারে দু'পৃষ্ঠা খেলাধুলার। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের কারণে এক পৃষ্ঠা বাড়ানো হয়েছে। এক পৃষ্ঠা আন্তর্জাতিক। এই পৃষ্ঠার অর্ধেকটা যায় বিজ্ঞাপনে। সাদাকালো সস্তা বিজ্ঞাপন— কারো জন্মদিনের শুভেচ্ছা, পাত্র-পাত্রী চাই, চাকরির বিজ্ঞপ্তি, নিখোঁজ/শোক সংবাদ, ফ্ল্যাট বিক্রি— এইসব। অর্থনীতি ও অন্যান্য সংবাদ দিয়ে এক পৃষ্ঠা। আজ শুক্রবার, সাহিত্য সাময়িকীর জন্য বরাদ্দ এক পৃষ্ঠা। বিনোদনের পৃষ্ঠাটা সম্পূর্ণ রঙিন। মানুষ গুজব পছন্দ করে। পৃষ্ঠাজুড়ে দেশ-বিদেশের বিনোদন জগতের গসিপ। এই ডেস্কে কাজ করে আদিত্য। মনের মতো খবর না পেলে বলিউডের সানি লিওন-পুনম পান্ডের মতো অভিনেত্রীদের খবর বানিয়ে বড় করে অর্ধনগ্ন ছবিসহ পাতা ছেড়ে দেয়। পরদিন আবার তার ওই বানানো খবর কোন্ কোন দৈনিক কিংবা অনলাইন কপি করেছে সেটা সে শফিককে দেখাতে আসে। শফিককে দেখানোর বিশেষ একটা কারণ আছে। ও চেয়েছিল বিনোদনের পাতাটা ছোট হয়ে মফস্বলের খবরের অংশ কিছুটা বাড়ুক। শফিকের কথা সম্পাদক কানে তোলেননি। তাই অল্প জায়গাতে অনেকগুলো নিউজ ধরাতে হয় ওকে। এসব খবর কেউ পড়ে না বলে সম্পাদকের বিশ্বাস। হত্যা-গুম-ধর্ষণ-মামলা এমন নীরস খবর পড়ার জন্য কেউ টাকা দিয়ে পেপার কেনে না। কিন্তু সংবাদপত্র যেহেতু, তাই

দেশের এসব দৈনন্দিন খবর বাদ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া মাঝে-মধ্যে ভাইরাল হওয়ার মতো দুর্দান্ত যে দু-একটি খুন কিংবা ধর্ষণের খবর আসে মফস্বল থেকে, সেগুলো চলে যায় প্রথম অথবা ব্যাক পেজে। যেমন বরগুনার প্রকাশ্য খুনের খবরটা প্রথম পাতায় চলে গেল। ফেনীর মাদরাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার খবরটি প্রথমে ইনারে গেলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় উঠলে প্রথম পাতার লিড হয়ে গেল। এর আগে তনু ও রূপার খবরটা যেমন গেছে। অন্তরালে ঘটা অন্যান্য খুনের খবর পড়ে থাকে ইনারে, মফস্বলের পাতায়। শফিকের মন খারাপ হয় ওর পাতাটা গুরুত্ব পায় না ভেবে। প্রতিটা খুন-গুম-ধর্ষণ স্ব স্ব পরিবারের জন্য সমান বেদনার। প্রকাশ্যে ঘটুক আর অন্তরালে, প্রতিটা খুনই নির্মম-নৃশংস। প্রতিটা খুনেই খুনের শিকার ব্যক্তির বেঁচে থাকার আকুতিটা একই রকম। কিন্তু যে খবরটি ভাইরাল হয় বা ভাইরাল হওয়ার মতো, সেটিই কেবল বিশেষ ট্রিটমেন্ট পায়। অন্যগুলো আলোতে আসে না। শফিকের মন খারাপ অবশ্য সে কারণে না। হত্যা-ধর্ষণের হট খবরগুলো ওর পাতাছাড়া হয় ভেবে ওর খারাপ লাগে।

যথারীতি আজও অনেকগুলো খুন-ধর্ষণের খবর এসেছে। কোনোটাই হিট বা ভাইরাল হবার মতো না। সবগুলো প্রতিদিনকার মতো। শফিকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এমন একঘেয়ে খুনের খবরে। এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মতো খুনিরাও খুনের স্টোরি কপি-পেস্ট করে। সব কিছুতেই বাঙালির মেধা কম। কালেভদ্রে এরশাদ শিকদারের মতো ক্রিয়েটিভ খুনি আসে। যাকে বলে সাইকো-কিলার। হলিউডের সিনেমায় কত ধরনের সাইকো-কিলার দেখা যায়। বাস্তবের ছায়া অবলম্বনে নির্মিত। এদেশের খুনিরা ওসব সিনেমা দেখে না বলে শফিকের বিশ্বাস। ওর হাতে ক্ষমতা থাকলে খুনিদের একত্রিত করে এসব সিনেমা দেখাত। তখন হয়তো শফিকের পাতার কদর বেড়ে যেত, সম্পাদক স্পেস বাড়িয়ে দিতেন।

অন্যদিনের মতো আজও গুম ও খুনের স্টোরিগুলো বাছাই করে সার্ভারে তোলে মফস্বল ডেস্কের সাব-এডিটর সুমন। রফিক পাঠাবে ধর্ষণ এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের খবরগুলো। কবির পাঠাবে অন্যান্য খবর। সুমনের পাঠানো ফাইলটা খোলে শফিক। পরপর নিউজগুলো সাজানো— গৃহবধূকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা; বাস-নছিমন সংঘর্ষে এক পরিবারের চারজনসহ মৃত

১০; নেশার জন্য মাকে গলা কেটে হত্যা; নদীতে হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার; নিখোঁজ শিশুর বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার; হাসপাতালের ড্রেন থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার; যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে খুন; পাটক্ষেতে অজ্ঞাত যুবকের লাশ; কলেজ কোন্দলে ২ ছাত্রলীগ কর্মী খুন; বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ ভাই-বোনের লাশ উদ্ধার; পুকুরপাড়ে দম্পতির গলাকাটা লাশ; মাকে দেখতে এসে লাশ হলেন সাংবাদিক; বউয়ের কথায় মাকে খুন। একটাও হিট হওয়ার মতো না। কদিন আগে একটা খবর ছিল, লিচু খেতে চাওয়ায় দু'কন্যাকে হত্যা করলেন বাবা, এমন মাঝারি মানের আকর্ষণীয় খুনের খবরও নেই। শফিকের মন খারাপ হয়। সমস্যা হলো বরগুনার ওই ঘটনার পর খুনিদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। এ ধরনের খুনের দৃশ্য ধারণ করে ফেসবুকে আপ করার জন্য অনেকে মোবাইলের ক্যামেরা অন করে ঘোরে। এর আগে সিলেটে শিশু রাজনকে জনসমক্ষে বেঁধে পিটিয়ে মারার সময় যেমন হয়েছিল, একজন পেটাচ্ছে, অন্যরা ছবি তুলছে, ভিডিও করছে। যে যত দ্রুত আপ করতে পারবে তার তত শেয়ার। এরকম একটু ভিন্ন ধরনের হত্যার খবর না পেলে জনগণ পড়ে শিহরিত হয় না। শিহরিত না হলে খবর পড়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তারা। খবরে আকর্ষণ বোধ না করলে পেপার কিনবে কেন! পেপার না কিনুক, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলেও তো লাভ, সংবাদপত্রের অনলাইন ভার্সনে ক্লিক বেড়ে যায়।

মাঝে মধ্যে কিছু খবর আসে হিট হওয়ার মতো না। কিন্তু জনগণ কি ভেবে যেন লুফে নেয়। আবার কিছু কিছু হত্যার খবর পড়ে মনে হয় ভাইরাল হবে, কিন্তু হয় না। হয়তো দেখা গেল, ভাইরাল হওয়ার মতো খুনের ঘটনা ঘটে গেল বাংলাদেশের ক্রিকেট ম্যাচের দিন। পুরাই ফ্লপ। সেদিন আর শফিকের পস্তানির শেষ থাকে না।

শফিক কয়েকটি খুনের খবর সংক্ষিপ্ত করে একটা খবরে নিয়ে আসে। শিরোনাম দেয় 'দক্ষিণবঙ্গে ৭ খুন', 'সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৯'—এইরকম করে। এতে কিছু জায়গা বেঁচে যায়। অন্য খবরও ধরাতে হবে। বিশেষ করে মফস্বল এডিটরদের কিছু পছন্দের খবর থাকে। ওগুলো না ছাপলে ওদের আয় বন্ধ হয়ে যাবে। হাউজ থেকে তো আর সকলে বেতন পায় না, যারা পায় তাও পাঁচের বেশি না। ওদের জন্য কোটা রাখতে হয়। হাউজ পলিসিতে এটা আছে; শফিকের না করার উপায় নেই।

খবরগুলো যখন ছেড়ে দেয় তখনই সুমন আসে। অন্যদিনের থেকে ওকে আজ বেশ শুকনো দেখায়। জড়সড় হয়ে শফিকের সামনের চেয়ারে বসে। এই সময় কাজের চাপ। খবরগুলো পেজ মেকআপে পাঠাতে হবে। বিজ্ঞাপন বাড়লে আবার ছেঁটে দিয়ে আসতে হবে। শফিক আগ্রহ দেখাতে না চাইলেও সুমনের চেহারা দেখে ঘুরে বসে।

শরীর খারাপ? আজ আগে যেতে চাও? শফিক জানতে চায়।

না বস। সুমন খসখসে গলায় উত্তর দেয়।

পানি খাও। তবে বেশি পানি খাবা না। রাজধানীর পানি যত কম খাবা ততই মঙ্গল। দেশে গেলে আমার মতো বেশি করে পানি খেয়ে আসবা। পারলে অক্সিজেনও রিজার্ভ করে আনবা। শফিক পানির বোতলটা সুমনের হাতে তুলে দিয়ে বলে।

বস, খবরটা পড়েছেন? সুমন জানতে চায়।

কোন খবর? শফিক ততক্ষণে কম্পিউটারের স্ক্রিনে মন ডুবিয়েছেন।

ওই যে খুনের?

খুন তো অনেকগুলো। কোনটা বলছ? সবগুলো তো পড়তে পারিনি। এত চাপ আজ সংবাদের। শফিক বলে।

শফিক খুন হয়েছে— ওই খবরটা? সুমন বলে।

আচ্ছা। পড়েছি বোধহয়। মনে পড়ছে না। কেন?

শফিকের বাড়ি মেহেরপুর বস। সুমন কিছু একটা বোঝাতে চায়।

তো?

আপনার বাড়িও তো মেহেরপুর?

মেহেরপুরে কি একজন শফিক আছে মিয়া? এটা খুব কমন নাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শফিক বলে ডাকো, দেখো চারজন উত্তর নেবে। তাছাড়া এক নামের কেউ মরলে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। মানে সে তো আর পরিবারের কেউ হবে না। এক-পরিবারে দুজনের নাম একরকম হতে দেখেছো কখনো? শফিক বলে।

খুন হওয়া শফিকের বাড়ি উজুলপুর। সুমন বলে।

তো?

গত বছর না উজুলপুর থেকে ঘুরে এলাম? আপনার ছোটোভাইয়ের বিয়েতে আমাকে নিয়ে গেলেন।

আচ্ছা, আমার গ্রামের ছেলে? খবরটা তাহলে মন দিয়ে পড়িনি। গ্রামে তো শফিক নামে আর কারও কথা মনে পড়ছে না। নতুন ছেলে হবে। গ্রামে থাকি না মেলা বছর, কখন কে কী নাম নিয়ে বড় হচ্ছে তা কী জানি! শফিক বলে।

বস, আপনি সম্ভবত বুঝতে পারছেন না! যে শফিক খুন হয়েছে তার বাবার নাম আবদুল্লাহ নাসের। প্রাইমারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আপনার বাবাও তো? সুমনের কথা এখন পরিষ্কার হয়।

আচ্ছা, হবে আরেকজন। শফিক উড়িয়ে দিয়ে বলে।

আবদুল্লাহ নাসের নামে একাধিক ব্যক্তি আপনাদের গ্রামে থাকতে পারে। কিন্তু এই নামে আপনার বাবা ছাড়া আর কোনো অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক আছেন? থাকলে তো আপনার চেনার কথা? সুমন জানতে চায়।

না, তা নেই। দেখো-গে, প্রতিবেদক বাবার নাম ভুল লিখেছে অথবা গ্রামের নামটাই ভুল করেছে। যে কোনো দিক থেকে ভুল একটা হয়েছে। ওকে ফোন দাও। বেশি কনফিউশন থাকলে এ খবর ছাপার দরকার নেই। এমনিতেই এটা ছাপার মতো খবর না। শফিক বলে।

বস, আপনি না তিন দিন আগে আপনার মাকে দেখতে বাড়ি গেলেন?

হ্যাঁ; গেলামই তো। কাল রাতে ফিরেছি। ভেবেছিলাম আজ অফিসে আসব না। কিন্তু শরীরটা চাঙ্গা থাকায় চলে এলাম।

খবরে এসেছে, মাকে দেখতে এসে জমিজমার জের ধরে খুন হলেন সাংবাদিক শফিক। আপনি তো বলছিলেন, জমিজমার কিছু ঝামেলা আছে; সময় পেলে মিটিয়ে আসবেন? সুমন বলে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে। ওর গলা আরও শুকিয়ে যায়।

শফিক উঠে দাঁড়ায়। ফের বসে। বিচলিত মনে হয় না। আমাকে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ; পাচ্ছ না? মৃত মানুষকে কেউ কখনো দেখেছে এভাবে ঘুরে বেড়াতে; অফিস করতে? সুমনকে প্রশ্ন করে। কিছুটা বিরক্ত বলে মনে হয় ওকে।

বস, খবরটা আপনি পড়েননি? সুমন বলে। ও এখন ভয় পাচ্ছে বলে মনে হয়।

না পড়িনি। জমিজমার জের ধরে খুন— এরকম মুখস্থ হত্যার খবর কেউ পড়ে? কোনোদিন ভাইরাল হতে দেখেছ এমন খবর? যে খুনকে

কেউ খুন বলে মনে করে না, তেমন খুন হলে আমি মানবো কেন? এ খবর ছাপা হবে না; যাও, ভিডিওসহ খুনের খবর নিয়ে আসো। না পেলে বিল্ডিংয়ের নিচে দাঁড়াও, নিজে মেরে নিয়ে আসো; কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। পকেটমারতে যাও জনগণ বাধা দেবে, কিন্তু খুন হতে দেখলে এগোবে না। চোখের সামনে সাক্ষাৎ খুনিকে মারবে না, কিন্তু গুজবে নিরপরাধ মানুষকে খুনি ভেবে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলবে। শফিক রেগে উঠে বলে। অস্বাভাবিক দেখায় ওকে। মনে হয় চোখ দিয়ে আগুন বের হয়ে আসবে।

শফিক রাগতে জানে না। অন্তত গত দশ বছরে একসঙ্গে চাকরি করতে করতে সুমনের সেটিই মনে হয়েছে। আজ শফিকের চোখের দিকে তাকানোর সাহস হয় না ওর। একবার মনে করে দৌড়ে বের হয়ে যাবে রুম থেকে। কিংবা ভূত ভূত বলে চিৎকার দেবে। কিন্তু ওর পা দুটো অসাড় হয়ে ওঠে। মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। ও চাইলেও উঠতে পারে না চেয়ার থেকে। চিৎকার করতে পারে না বাঁচাও বাঁচাও বলে।

যাও মিয়া। নিজে যদি কোনোদিন খুন হও, প্রকাশ্যে নতুন স্টাইলে খুন হবা। না-হলে কিন্তু খবরের কাগজে ধরাতে পারবা না। সারাজীবন কাগজে খুন-হত্যার খবর ছেপে গেলা, নিজে খুন হওয়ার খবরটা ছাপা হলো না, এই দুঃখ তখন রাখবা কোথায়! মরার পর যারা খুন হয়েছে তারা যদি জিগায়, আপনি কয় ইঞ্চি কয় কলাম? ইনারে না ফ্রন্টে? তখন মান-ইজ্জত কিছু থাকব? শফিক হাসতে হাসতে বলে। ওর কণ্ঠস্বরটা অচেনা মনে হয় সুমনের। মনে হয় যেন দূর থেকে কথাগুলো ভেসে আসছে।

সুমন আরও একবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। তখনই সম্পাদকের ফোন আসে শফিকের কাছে। আজ কোনো ভালো খবর আছে খুনের? ফ্রন্ট পাতায় জায়গা আছে। তিনি বলেন।

দেখছি বস— বলে ফোনটা রেখে শফিক সুমনের দিকে তাকায়। হাসে অচেনা হাসি। বলে, ফ্রন্ট পেজে জায়গা চাও? এমন সুযোগ রোজ রোজ আসবে না।

সুমন গ্লাসের ওপাশে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। শফিকের চোখ তখন সিসি ক্যামেরা খোঁজে।

ধর্ষণের প্রতিশোধ

রোজ পাঁচটা পেপার আসে মহসিনের বাড়িতে। অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক। শিক্ষকতা করে জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় কাটিয়ে দিলেও পেপার পড়ার অভ্যাসটা তার পুরাতন না। গত দশ বছর ধরে তিনি ও তার স্ত্রী পেপার পড়ছেন। একটা ঘটনা তাড়া করতে করতে তারা পেপার পড়ায় আসক্ত হয়ে উঠেছেন। পাঁচটা পেপারই দেশের শীর্ষস্থানীয়। এর মধ্যে একটা ইংরেজিও আছে।

পেপার আসে বেশ সকালেই। কিন্তু দুজনে সকালের নাশতা সেরে গোসল করে পেপার নিয়ে বসেন। বিষয়টা তাদের কাছে প্রার্থনা করার মতো দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকটা সময় নিয়ে দুজনে প্রতিটা পাতা উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখবেন। যেহেতু কোনো সন্তান নেই, তাই অন্য কারো জন্য কিছু করার তাড়া তাদের মধ্যে নেই। প্রতিটা পেপার ভালোমতো পড়া হয়ে গেলে মহসিনের স্ত্রী রাবেয়া কাঁচিটা আনবেন। লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া খবরগুলো মহসিন ওর হাতে একটা একটা করে তুলে দেবেন, তিনি বেশ যত্ন নিয়ে কাটবেন। ছবি থাকলে ছবিসহ, না থাকলে শুধু খবরটুকু। একটুও এদিক সেদিক হবে না। এত সময় নিয়ে কাটবেন যেন তাড়াতাড়ি কাটলে ভালো লাগা দ্রুতই ফুরিয়ে যাবে। বিরক্ত হওয়ার বদলে মহসিন আরো আগ্রহ নিয়ে দেখবেন। ফেলে আসা যৌথজীবনে স্ত্রীর আর কোনো কাজ তিনি এত আগ্রহ নিয়ে দেখেননি।

সবগুলো ধর্ষণ এবং ধর্ষণসংক্রান্ত খবর মহসিন রাবেয়ার হাতে তুলে দেবেন, রাবেয়া একটা একটা করে কাটবেন। একটা একটা করে ধর্ষণের খবর কাটবেন আর ওর চোখেমুখে আলো খেলে যাবে। একটা একটা করে ধর্ষণের খবরের কাটিং মহসিন হাতে নেওয়া মাত্রই মহসিনেরও

চোখেমুখে সেই আলো ঝিলিক মারবে। যত বেশি ধর্ষণের খবর, তত বেশি খুশি ওরা। কোনো খবরে যদি লেখা থাকে বছরের পর বছর ধর্ষণের বিচার না পেয়ে পথে পথে ঘুরছে ধর্ষণের শিকার কন্যার পিতা-মাতা। তখন মহসিন চিৎকার করে হাসতে হাসতে বলবেন, ধর্ষণের বিচার? ধর্ষণের আবার বিচার হয় নাকি? এটা কি বিচার হওয়ার মতো কোনো অপরাধ?

ধর্ষণেরও আজকাল বিচার চায়? মানুষের কাণ্ডজ্ঞান দেখে বাঁচি না! বলে হেসে ওঠে রাবেয়াও।

কাটিংগুলো এবার তারা আলাদা করে। একদিকে রাখে নতুন ধর্ষণ, আরেক দিকে রাখে পুরাতন ধর্ষণের ফলোআপ, আরেক দিকে রাখে ধর্ষণ-সংক্রান্ত কলাম বা কোনো এনজিও অথবা সংগঠনের সমীক্ষা। ওদের আগ্রহ থাকে মূলত নতুন ধর্ষণের দিকে।

আজ কত? ক্যাটাগরি অনুযায়ী আলাদা করার কাজ শেষ করে মহসিন জানতে চায়।

বারোটা। রাবেয়া উত্তর দেয়। ওরা নতুন ধর্ষণের ঘটনাটা কেবল গোণে।

গতকালের থেকে দুটো কম হলো। মহসিন এমন করে বলে যেন এতে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেছে। এশিয়া কাপে বাংলাদেশ মাত্র ২ রানে হেরে যাওয়াতেও এত কষ্ট পায়নি।

সব খবর তো আসে না। কত খবরের চাপ মফস্বলের পাতায়। সব ধর্ষণের খবর ছাপতে পারে নাকি? রাবেয়া এমন করে বলে যেন মনে হয় স্বামীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

তা ঠিক। অনেকে আবার নানা কারণে রিপোর্টও করে না। চেপে যায়। নিশ্চয় সংখ্যাটা আরও বেশি। মহসিনকে এখন কিছুটা নির্ভার মনে হয়।

পেপারগুলো সরিয়ে ধর্ষণের খবরের কাটিংগুলো এবার দুজনে নাড়াচাড়া করতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে দেখে যেন কোনো আনন্দের সংবাদে তাদের চোখ এঁটে আছে। মেয়েটার ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পাওয়ার খবর পত্রিকায় ছাপা হলে এভাবে ওরা দেখেছিল। এরপর মেয়েটা যখন ভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হলো, কোচিং থেকে ছবিসহ পেপারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, বিজ্ঞাপনটা মনে হচ্ছিল বাবা মা চোখের

সামনে টাঙিয়ে রাখে চব্বিশটা ঘন্টা। মহসিন মাস্টার কাটিংটা তার এক ছাত্রকে দিয়ে লেমিনেটিং করিয়ে স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। বলেছিলেন, বৃত্তি পাওয়ার ওই খবরটার সঙ্গে রেখে দাও।

আজও তিনি পেপারের কাটা অংশগুলো একত্রিত করে রাবেয়ার হাতে দিয়ে বললেন, ধর্ষণের আগের কাটিংগুলোর মধ্যে রেখে আসো। না বললেও রাবেয়া রাখতে যাবে, রাখার জন্যই তো কাটা; কিন্তু বলাটা তার অভ্যাস।

রাবেয়া কাটিংগুলো নিয়ে যাবে শোবার ঘরে। আলমারির সবচেয়ে বড় ড্রয়ারটা খুলবে। এক ড্রয়ার সরিয়ে রেখেছে, আরেকবার ভর্তি হওয়ার পথে। প্রতিদিন নতুন কাটিং রাখার সময় আগের কাটিংগুলো নেড়েচেড়ে দেখাটা ওর অভ্যাস। রাবেয়া নেড়েচেড়ে দেখে। প্রতিদিনকার মতো মহসিন পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। এই দৃশ্যটা দেখতে দুজনেরই ভালো লাগে। ধর্ষণের খবরে ভরে উঠেছে তাদের আলমারির ড্রয়ার।

রাবেয়া ড্রয়ারটা খোলা রেখে উঠে দাঁড়াবে। বিছানার নিচ থেকে আরো কিছু পেপার কাটিং বের করবে—সেই কবেকার, লেমিনেশন করা। এক কিশোরী মেয়ের ছবির উপর হাত বোলাবে। নিচে পড়ে আরো কিছু পেপার কাটিং। বছর দশেক আগের। কোনো একটাতে মহসিন মাস্টার এবং রাবেয়া খাতুনেরও ছবি ছাপা হয়েছে। দুজন একা দাঁড়িয়ে। বিচারের দাবি নিয়ে। বুকে প্ল্যাকার্ড। মহসিন এই কাটিংটা হাতে নিয়ে হাসবে। রাবেয়াকে দেখিয়ে বলবে, দেখো, বোকা দুজন মানুষের কাণ্ড দেখো। ধর্ষণ কি বিচার পাওয়ার মতো কোনো অপরাধ? দুজন বেকুব নাকি দিনের পর দিন বিচার চেয়ে যাচ্ছে! এটা কোনো কথা হলো?

রাবেয়া এবার রেগে যাবে। রেগে গেলেও হাসবে। হাসতে হাসেতে উচ্চকণ্ঠে বলবে, হ্যাঁ ধর্ষণ কোনো অপরাধ না। খুব সামান্য ঘটনা।

প্রতিটা বাড়ির কেউ না-কেউ যেদিন ধর্ষণের শিকার হবে, তখন দেশের মানুষ নিশ্চয় সেটা বুঝবে। মহসিন তাল দেবে। নিজেও পাগলের মতো হাসতে থাকবে।

এবার দুজনে খোলা ড্রয়ার থেকে ধর্ষণের খবরের কাটিংগুলো হাতে নিয়ে ছিটিয়ে দেবে মাথার উপর। ঘরভর্তি হয়ে যাবে ধর্ষণে। বিছানায়, বিছানার কোনায়, বিছানার নিচে, ড্রেসিং টেবিলে, মেঝেতে, চেয়ারের পায়ার কাছে, দেয়ালের ঝুলে, ঝুলন্ত ঘড়িতে—ধর্ষণের খবর ছিটিয়ে যাবে।

দুজনের হাসি তখনো থামবে না। এরপর পাগলের মতো দুপুরের খাওয়া ভুলে খুব যত্ন করে একটা একটা করে ধর্ষণের খবরের পেপার কাটিংগুলো কুড়িয়ে বিছানায় জড় করবে। সবগুলো পেয়ে গেলে মহসিন আয়রনটা আলমারির উপর থেকে নামাবে। হালকা আঁচে একটা একটা করে ধর্ষণের খবর আয়রন করে রাবেয়ার হাতে দেবে, রাবেয়া মাত্রই ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর মতো সাবধানে ধরবে। এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে অনেক বছর আগে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কোনো শিশুর প্রথম দেখা চেহারাটি ভেসে উঠবে।

রাবেয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠবে।

মহসিন আয়রন করা থামিয়ে যোগ দেবে সেই কান্নায়।

সহসা রাতটা শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে ওদের চোখেমুখে আলো খেলে যাবে। সকাল হলেই নতুন পেপার আসবে।

মিসিং পিৎজা বয়

অনলাইন থেকে খাবার অর্ডার করেছে সানাউল্লাহ— নিজের জন্য কম্বো বার্গার আর মেরিনার জন্য মিডিয়াম সাইজ পিৎজা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এলো। ছ-তলা ভবনের মাথায় থাকে ওরা। পুরাতন বিল্ডিং, লিফট নেই। বৃদ্ধ দারোয়ান রইস মিয়া সব দেখাশোনা করে। বাড়ির মালিক থাকেন নতুন ফ্লাটে।

সানাউল্লাহ এই বাসাটা নিজের নাম ও পরিচয় বদলে ভাড়া নিয়েছে। ও জানত এ-রকম সমস্যা কোনো না-কোনোদিন হবেই। প্রয়োজনীয় আসবাব, একটা ছোট পরিবারের জন্য যা যা প্রয়োজন সবই আছে। টাকা-পয়সা নিয়ে ওর সমস্যা নেই, চিন্তা নিরাপত্তা নিয়ে। এই কারণে এক দিন না থেকেও এক বছর ধরে ভাড়া টেনে যাওয়াটা ওর জন্য ঝামেলার মনে হয়নি। এই প্রথম ওরা সাত দিন হলো এখানে উঠেছে। আরো ভালো করে বললে গা-ঢাকা দিয়েছে।

ডেলিভারি বয় নিচে এসে রইস মিয়াকে বলেছে, সবুজ স্যারের অর্ডার। দারোয়ান ছেলেটাকে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। পায়ের ব্যথার কারণে নিজে ছ'তলায় উঠতে নামতে পারে না।

মেরিনা দরজা খুলল। সানাউল্লাহ তখন খবর দেখছিল। ওর ছবি দেখাচ্ছে। বছর পাঁচেক আগের ছবি, পুলিশ কীভাবে যেন বের করে ফেলেছে। সানাউল্লাহ টাকা দিতে গেছে। ছেলেটার মুখোমুখি হতেই ওর গা কেঁপে উঠল। মনে হলো বড় রকমের একটা ভুল মাত্রই করে ফেলেছে। ছেলেটিকে ভেতরে ডেকে বসায় সে। মেরিনাকে আড়ালে ডাকে। দুজনে ফিসফাস করে। একটা ত্বরিত ভাবনা ওদের মাথায় একসঙ্গে খেলে যায়।

মেরিনা রান্নাঘরে ঢোকে। সানাউল্লাহ ছেলেটির পেছনে এসে দাঁড়ায়। স্যার, আপনার ছবি খবরে দেখাচ্ছে। এখান থেকে আর বের হয়েন না। জায়গাটা—। কথা শেষ করার আগেই মেরিনা পেছন থেকে কাঁধের উপর বসিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য দৃশ্য যেন থেমে গেল। ছেলেটি চিৎকার করে উঠেছে কিনা ওরা মনে করতে পারে না। দৃশ্য যখন সচল হয় দেখে রক্ত ছিটিয়ে পড়ছে। ছেলেটি পড়ে গেছে চেয়ার থেকে। মরার মতো কোপ পড়েনি। সানাউল্লাহ মেরিনার হাত থেকে ধারালো বঁটিটা নিয়ে গলায় একটা পোঁচ মেরে দিল। দশ বছর আগেও বাড়ির যত কোরবানির ছাগল ও জবাই করেছে। ছেলেটার পা দুটো শক্ত করে ধরে রেখেছিল মেরিনা। এরপরও শক্তি দিয়ে ছেলেটি ওদের ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, শক্তসমর্থ যুবক, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফের পড়ে যায় মাটিতে। বুকের কাছে ঝাঁকুনি, পা ছড়াছড়ি, হাতটা মুঠো বাঁধার চেষ্টা, একচোখ বোজা, অন্যচোখ তখনো দেখছে বলে মনে হয়, রক্তমাখা ঠোঁট দুটো, উপরেরটা তিরতির করে কাঁপছে, নিচেরটা নিশ্চল। সব নড়াচড়া বন্ধ। শেষ।

মেরিনা বেসিনে গিয়ে বমি করতে থাকে। সানাউল্লাহ রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ঢুকে পড়ে বাথরুমে। বেশ কিছুক্ষণ পর বের হয় নগ্ন হয়ে। মেরিনা কাঁদছে। বলে, এক বিপদ থেকে বাঁচতে আরেকটা বিপদে পড়ে গেলাম! সানাউল্লাহ কী ভেবে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে দারোয়ানকে।

চাচা, ডেলিভারি বয় একটু আগে বের হয়েছে, থামাও তো, ম্যানিবাগটা তুলে নিয়ে গেছে।

স্যার, আমি তো কাউকে বের হতে দেখলাম না।

তোমার সামনে দিয়েই তো গেছে। এভাবে যদি দেখো তাহলে চোর সামলাবে কেমন করে? আজকাল চুরি এদিকে খুব বেড়েছে; জানো তো? তোমার চাকরি নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

না স্যার। আমি সব দেখতে পাই। একটু আগেই আমার সামনে দিয়ে গেল ছোকরা। আমি ভেবেছি তিন তলার রফি। আপনি রাখেন, আমি ধরছি। কলটা কেটে দেয়। সানাউল্লাহ বারান্দায় যেতে গিয়েও যায় না। মেরিনা বাথরুমে। ড্রয়িংরুমে একা যাওয়ার সাহস হয় না। দারোয়ানকে ফের ফোন করে।

পেলে?

না স্যার। দৌড় দিয়েছে। আমি ধরতে গেলাম, চোখের সামনে দিয়ে দৌড়ে পালাল। আরেকটু হলে ধরেই ফেলতাম, বয়সের কারণে হলো না।

হুম তোমার বয়স হয়েছে। চোখটা একবার দেখিয়ে নিও। এবার অল্পের উপর দিয়ে গেল। এরপর কিছু হলে তোমার চাকরি কেউ বাঁচাতে পারবে না।

জে স্যার। এই বয়সে চাকরি গেলে চাকরি পাবো না। পঙ্গু ছেলেটাকে নিয়ে ভিক্ষা করতে হবে। আপনার পা ধরি স্যার।

দেখা যাবে। বলে সানাউল্লাহ ফোনটা রেখে দেয়।

মেরিনা তখন বের হয়, সানাউল্লাহর মতো কাপড়চোপড় ছেড়ে। মেরিনাকে এভাবে দেখলে সানাউল্লাহর মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। এখন সে-রকম সময় না। দুজনে নগ্ন হয়ে ড্রয়িংরুমে যায়। ছেলেটা পড়ে আছে সটান। পুরো ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। দুজন দুটো বড় কাপড় নিয়ে রক্তগুলো মুছে বালতিতে রাখে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব রক্ত ধুয়ে ফেলে বাথরুমের কমোডে। এবার ছেলেটিকে ধরে—মেরিনা পায়ের দিকে, সানাউল্লাহ মাথার দিকে। মাথাটা সামান্য বেঁধে ছিল পিঠের দিক থেকে। ও বঁটি দিয়ে ছাড়িয়ে দেয়। খুব কষ্ট করে দুজনে বাথরুমে রাখে।

এখন? মেরিনা বলে।

পেট জ্বলছে। আগে বার্গারটা খেয়ে নিই। একটা কিছু মাথায় চলে আসবে।

মেরিনা প্যাকেট আর একটা প্লেট ধুয়ে শোয়ার ঘরে আসে। প্লেটে বার্গার আর পিৎজা সাজাই।

একটা সিনেমা দেখেছিলাম বছর তিনেক আগে। মনে আছে? মেরিনা বলে।

কোনটা? এখন সিনেমা মনে আসার সময়? সানাউল্লাহকে বিরক্ত মনে হয়।

কোনটা বুঝছ না? এখন সময় বলেই তো মাথায় আসল!

বুঝেছি। বলে সানাউল্লাহ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। কিন্তু ফ্রিজে কি ধরবে? ও জিজ্ঞাসা করে।

ধরবে না কেন? ডিপ ফ্রিজটা পুরো খালি। কিছু ফ্রোজেন ফুড আছে, বের করে রাখছি। দু তিন দিন যাবে।

হুম। পিসপিস করতে হবে। সানাউল্লাহ বলে।

সেটা তো তুমি পারোই। মরে গেলে মানুষ আর ছাগলে পার্থক্য কোথায়!

বাথরুমে কোনো মতে কেটে ছোটো করে ধুয়ে অনেকগুলো পলিথিনে পুরে ডিপে রেখে দেয় দুজনে মিলে। সানাউল্লাহর অভিজ্ঞ হাত। সময় যা লাগার তার থেকে কমই লাগল।

খ.

সানাউল্লাহ হরিণের মাংসের কারবার করছে প্রায় দশ বছর থেকে। গোপনে সুন্দরবন ও নোয়াখালীর হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপ থেকে এসব মাংস রাজধানীতে আসে। বিনিয়োগ থেকে শুরু করে সাপ্লাই এবং সব ধরনের ঝুঁকির দিকটা সানাউল্লাহ সামলায়। মাংসের আড়ালে বন্যপশুর চামড়া চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত। মূলত কারবার ওটাই। একসময় সে নিজেও হরিণ ধরা ও মাংস সংগ্রহের কাজ করেছে। মাছ ধরার পারমিট-পাস নিয়ে ওরা জঙ্গলে যায়। নাইলনের দড়ির এক ধরনের ফাঁদ হরিণের নিয়মিত যাতায়াতের পথে পাতা হয়। এক রাতে পেতে আসে, পরের রাতে গিয়ে আবার দেখে। ফাঁদে আটকে কিছু কিছু হরিণ মারাও যায়। মৃত হরিণের মাংস এলাকাতে বিক্রি হয়ে যায়। স্থানীয় দাম খুব কম। রাজধানীতে এক হাজার টাকা করে বিক্রি করা যায়।

গত ঈদে দশ মণ হরিণের মাংস, কতকগুলো হরিণের খুলি, আর চামড়া উদ্ধার করেছে পুলিশ। উঠে এসেছে সানাউল্লাহর নাম। এর পরই আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো 'যেভাবে চলে হরিণের মাংসের ব্যবসা' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিবিসি। যোগ দিয়েছে দেশি মিডিয়াও। তারপর থেকেই রাজধানীর পুলিশ সানাউল্লাহকে ধরার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

এখন আরো সাবধানে থাকতে হবে। লাইসেন্স ও অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া বন্যপ্রাণীর মাংস আমদানি-রপ্তানির কারবার করতে গিয়ে ধরা পড়লে সর্বোচ্চ এক বছরের সাজা, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। কিন্তু এখন থেকে তাদের মাথার উপর খুনের দায় যুক্ত হলো। এ ঘটনার পর ধরা পড়লে যাবজ্জীবন জেল পর্যন্ত হতে পারে।

সানাউল্লাহ বাসা থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মেরিনাকে ওর সঙ্গে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেকেই দেখেছে। তাই ওরও বের হওয়া

নিরাপদ না। বাসায় শুকনো খাবার যা আছে তাতে ডাল, আলুভর্তা আর ভাত খেয়ে এক মাস চলে যাবে। এখন আর ওদের খাবার নিয়ে ভাবলে চলছে না। প্রতিদিন কটা ভাত বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া। সানাউল্লাহ মাংসপ্রিয় মানুষ—টেবিল এবং বিছানা দু জায়গাতেই। কারবার শুরু করে থেকে হরিণের মাংস ও নিয়মিত খায়। অন্যদিকে মেরিনা ওর পঞ্চম স্ত্রী। মাংসের ব্যাপারে সর্বভুক মেরিনাও। কিন্তু আপাতত সেসব নিয়ে ভাবলে চলছে না। দুজন খাওয়ার সময় অন্যান্য আলাপ তুলে কোনোমতে এই বিরক্তিকর মুহূর্তটি কাটিয়ে দেয়।

কিন্তু কখনো না কখনো সব ধরনের সহ্য করার ক্ষমতা কিংবা ধৈর্য্যশক্তি ভেঙে পড়ে। যেমন দিন দুয়েক আগে রাতে খেতে বসে না খেয়ে উঠে পড়ল সানাউল্লাহ। বলল, রোজ এই ছাইপাঁশ খাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। মেরিনা বাধ্য হয়ে খেল, কারণ শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে দুপুরে সে নিজেও খায়নি। মেরিনা যখন টেবিলে বসে একা একা খাচ্ছিল তখন পাশের ঘর থেকে সানাউল্লাহ বলল, চলো পুলিশের কাছে ধরা দিই। জেলে আর যাই দিক, এর চেয়ে খারাপ খাবার দিতে পারবে না। মেরিনা কোনো কথা না বলে ভাতের মধ্যে পানি ঢেলে কাঁচামরিচ আর লবণ দিয়ে খায়, এতে যদি স্বাদে কিছুটা ভিন্নতা আসে।

আজ এতদিন বাদে মেরিনা খিচুড়ি রান্না করেছে। খিচুড়ি সানাউল্লাহর ভীষণ প্রিয়। কিন্তু মাংস ছাড়া ও শেষ কবে খিচুড়ি খেয়েছে মনে করতে পারবে না। মেরিনা সেটা জানে। সানাউল্লাহ কোনো কথা না বলে হাফ প্লেট খিঁচুড়ি নিয়ে নাড়তে থাকে। খাবার নিয়ে কথা বলার সময় এখন না। মেরিনা রান্নাঘর থেকে আরেকটা বাটি নিয়ে টেবিলে আসে। ডিম ভুনা বা ভাজি দিয়ে বহু বছর পর খিচুড়ি খাবে সানাউল্লাহ। মেরিনা চামচসহ বাটিটা সামনে রাখে। এক বাটি মাংস। বড় বড় টুকরো। মেরিনা এত চমৎকার মাংস রাঁধে যে, সানাউল্লাহ এরকম একটা বাটি মুহূর্তেই শেষ করে দিতে পারে। বাটিটা বেশ বড়ই। অর্ধেকটা ও একবারে তুলে নেয়।

চমৎকার হয়েছে। সানাউল্লাহ বলে।

মনে হচ্ছে জীবনে প্রথম মাংস খাচ্ছি।

এত স্বাদের হরিণের মাংস কখনো খাইনি।

মাংস এত স্বাদের হতে পারে? সানাউল্লাহর মুখ বন্ধ হয় না। কতদিন পর খাচ্ছি বলো তো?

মেরিনা কোনো কথা না বলে নিজেও খেতে থাকে প্রিয় মাংসের রেসিপি। ঝাল ভুনা।

আচ্ছা, হরিণের মাংস তো এখানে আনা হয়নি? কোনো মাংস কেনাও হয়নি! পেলে কোথায়? খাওয়ার একেবারে শেষ দিকে এসে সানাউল্লাহ জানতে চায়।

মেরিনা কোনো উত্তর করে না।

সর্বনাশ! অনলাইনে তো অর্ডার করোনি? সব ফাঁস হয়ে যাবে। সানাউল্লাহ একটা বড়ো হাড় চুষতে চুষতে বলে।

মেরিনা কোনো উত্তর করে না।

নাকি কেয়ারটেকার চাচাকে আনতে দিয়েছিলে? তার মানে তুমি নিচে নেমেছিলে? এটা তুমি একদম ঠিক করোনি। সানাউল্লাহকে এবার রাগান্বিত বলে মনে হয়।

ফ্রিজে আছে না! ভুলে গেলে? মেরিনা শীতল কণ্ঠে জবাব দিয়ে টেবিলে পড়ে থাকা হাড়গুলো গোছাতে থাকে।

গ.

দু বছর হয়ে গেল। সানাউল্লাহকে খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। হরিণের মাংসের কারবার এখন বন্ধ। কিংবা অন্য কেউ করছে। বিষয়টি চাপা পড়ে গেছে। সাধারণত একটা বড় ঘটনার ফলে অন্য একটা বড় ঘটনা এভাবেই ধামাচাপা পড়ে যায়। লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। মানুষ মেতে ওঠে নতুন কোনো ইস্যুতে। এই মুহূর্তে রাজধানীসহ দেশ তোলপাড়, দু বছরে পাঁচজন পিৎজা বয় মিসিং!

বাক-স্বাধীনতার অনন্য দৃষ্টান্ত

ফ্রিল্যান্ডের আজ মহান স্বাধীনতা দিবস। দেশটির স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে সরকার একটি মহান প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশটির রাজধানী ফ্রিডম শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় এক উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র। দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানীরা সেখানে একসঙ্গে মিলে এক বছর তিন মাস দশ দিন গবেষণা করে একটি চিপ আবিষ্কার করেছেন। মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও নাগরিক অধিকারের ইতিহাসে অভূতপূর্ব আবিষ্কার। বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এই আবিষ্কারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

নবজাতকের টিকা প্রদান কার্যক্রমের মতোই জন্ম হওয়ার পর চিপটি শিশুদের পেছনে মাথার নিচে ডান পাশে খুব সামান্য একটা অপারেশনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে দেওয়া হবে। এরপর আমৃত্যু থাকবে শরীরে। তবে চিপের উৎপাদনে সংকট থাকার কারণে প্রথম পর্যায়ে কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া হবে বলে সংসদে ঠিক করা হয়। কিন্তু মাসকতক পর দেখা গেল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত চিপ উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। তাই নতুন করে ঠিক করা হলো কাজটি কয়েক ধাপে সম্পন্ন হবে। প্রথম ধাপে সরকারি বেসরকারি দলের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দেওয়া হবে। অগ্রাধিকারভিত্তিকে সরকারের কয়েকজন সিনিয়র সচিবও পাবেন। সরকার এই ঘোষণা দেওয়ার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। কয়েকজন সিনিয়র অধ্যাপক চাকরি হারানোর তোয়াক্কা না করে একটি জাতীয় দৈনিকে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে বসলেন। আমলাদের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা সরকারের ভাবা উচিত ছিল। কারণ

পনেরো বছরের স্বৈরশাসক হটিয়ে এই গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতায় আনার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান শিক্ষকদের।

এই বিবৃতির ফলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে বিলে সংশোধনী আনা হলো। প্রথম পর্যায়ে যারা এই বিশেষ চিপ সেট পাবেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নাম। কিন্তু অধ্যাপকদের এই সুবিধা দেওয়া হবে শুনে দেশের লেখক-শিল্পীদের সম্মিলিত জোটও আরেকটি বিবৃতি প্রকাশ করে বসলেন। স্বৈরশাসক ক্ষমতায় থাকার সময় সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয়েছেন দেশের লেখকশিল্পীরা। ফলে এই উদার গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে তাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি। রাষ্ট্রীয় যে কোনো ক্ষেত্রে অধ্যাপক-আমলাদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নন লেখকশিল্পীরা। লেখক-শিল্পীদের কদর যে জাতি করে না, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

এই রকম কথার পর আর কোনো কথা থাকে না। ফলে সরকার তৃতীয়বারের মতো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে প্রাথমিক পর্যায়ে লেখকশিল্পীদের প্রতিনিধি হিসেবে একশজনকে এই চিপ দেওয়া হবে বলে জানাল। এরপর অগ্রাধিকারভিত্তিকে আরও পাঁচশ লেখকশিল্পীকে দেওয়া হবে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে। সেই সঙ্গে দেশের অন্যান্য শিক্ষিত মানুষকে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হবে—প্রথমে সরকারি কর্মকর্তাদের। এরপর পাবেন যারা ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ক্রমেই দেশের অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক এই সুবিধা পাবেন। যারা চিপসেট পাবে, তারাই কেবল যে-কোনো বিষয়ে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। চিপ সেটের বিষয়টি একধরনের জাতীয় অনুমোদন-সনদের মতো কাজ করবে। এক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করলে তিরস্কৃত তো হবেনই না বরঞ্চ পুরস্কৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে বছরের শ্রেষ্ঠ সমালোচকের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন। এছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ও নানাভাবে প্রণোদনা দেওয়া হবে।

আজ ১ জানুয়ারি, স্বাধীনতা দিবসে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী, একজন জাতীয় অধ্যাপক এবং একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালকের মাথায় চিপ সেট করার মধ্য দিয়ে এই মহান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হবে।

দেশের মিডিয়াগুলো ফ্রন্ট পেজ এই আনন্দ সংবাদে ভরে ফেলেছে। ব্রেকিংনিউজ ঝুলে আছে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে। স্বাধীনতার মাত্র পঁচিশ বছরে ফ্রিল্যান্ড এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো রাষ্ট্র করতে পারেনি। দেশটির সংগ্রামী ইতিহাসে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরাধীন জাতি হিসেবে থাকতে হয়েছে। জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করল সামনে থেকে অথচ যুদ্ধজয়ের পরপরই ক্ষমতা চলে গেল সেনাবাহিনীর হাতে। নামেই স্বাধীনতা। দশ বছর আরেক ধরনের পরাধীনতার ভেতর দিয়ে যায় ফ্রিল্যান্ড। নিজেদের গড়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা নেয় দেশটির ফ্রি মুভমেন্ট পার্টি। কিন্তু কিসের কী! কিছুদিন পরই দলটি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বসে। নির্বাচন উঠিয়ে দিয়ে টানা পনেরো বছর ক্ষমতায় ছিল। শেষ দিকে এসে তো মানুষ মতপ্রকাশ করার বিষয়টিই ভুলে যেতে বসেছিল। একজন কৃষক খুব সরলভাবে গাঁয়ের মোড়ে শুধু বলেছিল, দেশের কৃষকরা ভালো নেই। অমনি কৃষি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চলে গেল তার কথা। পরদিনই কৃষক জেলে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন 'শ্রেণিব্যবস্থা', তার বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রবিরোধী' কেইস হয়ে গেল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে দেশদ্রোহী 'খেতাব' পেল দেশটির স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার। ভালোবাসার কোনো জাতধর্ম নেই, এই কথা বলে ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানার কারণে জেলে গেল কলেজের ধর্মশিক্ষার শিক্ষক। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে না, এর একটা প্রভাব সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও পড়েছিল। হবু শ্বশুর হয়তো পাত্রকে জিজ্ঞেস করল, তোমার মত কি বাবা? পাত্রের বাবা তখন বলে উঠলেন, ওর আবার কিসের মত! কিংবা ডাক্তারের কাছে হয়তো রোগী জানতে চাইল, অপারেশনের বিষয়ে আপনার কি মত ডাক্তার সাহেব? ডাক্তার তখন ভূত দেখার মতো চমকে বলে উঠলেন, না, না, আমার কোনো মত নেই। আমি লিখে দিচ্ছি, আপনার যা করার করবেন।

এসব কারণেও মানুষের ভেতর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। একটা পর্যায়ে রক্তক্ষয়ী গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শাসনক্ষমতা থেকে ফ্রি মুভমেন্ট পার্টির পতন ঘটে। এই গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল জাতীয় ডেমোক্রেট পার্টি।

সরকার ঘোষণা দিয়েছে এখন থেকে জনগণ সত্যিকারের স্বাধীনতা উপভোগ করবে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা শতভাগ নিশ্চিত করা হবে।

লেখকরাও যা ইচ্ছা লিখতে পারবেন। স্বাধীনভাবে নাটক সিনেমা বানাতে পারবেন পরিচালকরা। কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না সরকার। অনলাইনে মুক্তমতবিরোধী যে আইন আগের সরকার প্রণয়ন করেছিল সেটা বাতিল করা হবে মানুষের মস্তিষ্কে এই চিপ সেট প্রতিস্থাপন কার্যক্রম উদ্বোধন করার মঞ্চে। দেশের শতভাগ চিপ সেট সেদিন প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হবে সেদিন থেকে দেশের শতভাগ মানুষ মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে শতভাগ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে।

এই স্বাধীনতার পেছনে সরকারের সদিচ্ছাই প্রধান। প্রধানমন্ত্রী এই সেদিনও বললেন ভলতেয়ারের সেই অসামান্য কথা, 'তোমার মতের সঙ্গে আমি হয়তা একমত নাও হতে পারি; কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে যাবো।' এই চিন্তা থেকেই তিনি হয়তো চিপ সেটের মহাপ্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন।

সরকারের এই উদার বৈপ্লবিক চিন্তার পেছনে চিপ সেটের একটা ভূমিকা অবশ্যই আছে। মানুষের মস্তিষ্কে সরকার ও জাতীয়ধর্ম বিরোধী কোনো চিন্তা মাথায় এলেই একটা মৃদু ভাইব্রেশন হবে। তবে কতটা মৃদু এখনই বলা যাচ্ছে না। চিপ সেটে কিছু সেট প্রোগ্রাম আছে, সেখানে মানুষ কতটুকু ভাবতে পারবে না-পারবে সে বিষয়ে নীতিমালা দেওয়া আছে। নীতিমালার বাইরে গেলেই ভাইব্রেশন হবে। নীতিমালাগুলো তৈরি করেছেন দেশের ক্ষমতাসীন দলের বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা, দলীয় বুদ্ধিজীবী, জ্যেষ্ঠ আমলা ও ধর্মীয় নেতারা বসে।

শাস্তি হিসেবে কমিটির প্রস্তাব ছিল, প্রথম ভাইব্রেশনে বিশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা এক বছরের জেল। দ্বিতীয় ভাইব্রেশনে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা পাঁচ বছরের জেল। তৃতীয় ভাইব্রেশনে এক লক্ষ টাকার জরিমানা অথবা অনাদায়ী হলে দশ বছরের জেল। জেলে থাকা অবস্থায় যদি ভাইব্রেশন হয় তাহলে শাস্তির প্রথম মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হবে। দশম ভাইব্রেশনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

কিন্তু শাস্তির এই প্রস্তাবে সরকারের উপদেষ্টা কমিটি ভেটো দেয়। প্রথমত, দেশের বাহাত্তর ভাগ মানুষ যেহেতু দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে তাই অধিকাংশ মানুষের পক্ষে অর্থদণ্ড দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, দেশে অপরাধ এমনিতেই এত বেশি যে, জেলে এরই মধ্যে স্থানের সংকট দেখা দিয়েছে। এই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শাস্তি হিসেবে তাদের বিকল্প

প্রস্তাব হলো, ভাইব্রেশনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষয় হবে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাইব্রেশনে স্মৃতির কতটা ক্ষয় হবে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা না থাকলেও জানানো হয়েছে যে, চতুর্থ থেকে পঞ্চম ভাইব্রেশনে মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্পূর্ণ লোপ পেতে পারে। পঞ্চম থেকে সপ্তম ভাইব্রেশনে গিয়ে স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হবে অথবা পাগল হয়ে যেতে পারে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে যদি দশম ভাইব্রেশন পর্যন্ত ওঠে, তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু অল্প সময় বলতে মধ্যবর্তী ব্যবধানটা ঠিক কত সেটি নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি।

উপদেষ্টা কমিটির বিকল্প প্রস্তাব সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে শাস্তি হিসেবে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হলে দেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলো আপত্তি তোলে। কিন্তু যেহেতু দেশের মানুষ মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা পাচ্ছে এবং যেহেতু দেশের দুবৃত্ত ও বিশৃঙ্খল সৃষ্টিকারীরা দেশটির বহুল প্রতীক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কথা মুখে আনা বা লেখা তো দূরের কথা চিন্তাও করতে পারবে না, তাই সংগঠনগুলোর আপত্তি সাধারণ জনগণ এবং বুদ্ধিজীবীদের সন্তুষ্টির মুখে টেকেনি। মতপ্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে সাংবাদিক থেকে শুরু করে লেখক ও শিল্পীসমাজও যারপরনাই আপ্লুত ও আনন্দিত।

আইসিটি অ্যাক্ট রদ এবং মানুষের মস্তিষ্কে সেলফ সেনসরড চিপ সেট প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে ফ্রিল্যান্ডের পঁচিশতম মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন মানুষের বাক-স্বাধীনতার একটি অনন্য অসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

পুনরুত্থান

মধ্যরাতে কবর থেকে উঠে এসেছে রহমান। মৃত্যুর দশ দিন যেতে না-যেতেই তার এই উত্থান। জানতাম ওর যা হতচ্ছাড়া স্বভাব তাতে বেশিদিন টিকতে পারবে না ওখানে। কোনো স্কুলেই এক বছরের বেশি যায়নি, এ জন্য অশিক্ষিতই থেকে গেল। আমরা বন্ধুরা যেখানে পাল্লা দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ডিগ্রি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, রহমান সেখানে দিব্যি দেশজুড়ে ফেরি করে ফিরছে তার এই হতচ্ছাড়া স্বভাব। আমি আর পশ্চিম পাড়ার সফদার যেদিন কর্মজীবন শেষ করে অবসর নিয়ে ফিরে এলাম গ্রামে, তার মাস খানেকের মধ্যে রহমান যেন কোথা থেকে উদয় হলো। বহু বছর পর আমাদের সাক্ষাৎ। এতদিন কোথায় কোথায় ছিল সে আলাপে আমরা যাইনি। আমি জানতাম ওর সে গল্প শেষ হবার নয়, তাই ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছি। দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার আগেই ওর মৃত্যুসংবাদ এলো।

রহমান কবর থেকে উঠে সোজা চলে এসেছে আমার কাছে। মধ্যরাতে ঘুম থেকে তুলে বলে কিনা— আমি যে মরলাম, তুই তো একটুও কাঁদলি না! মন খারাপও হয়েছে কিনা সন্দেহ।

আমি চোখ কচলাতে কচলাতে বললাম, জানতাম তুই ঠিকই ফিরে আসবি। খালি খালি কান্নার অপচয় করতে চাইনি। ওই মধ্যরাতে রহমান এক কাপ চা খেয়ে বিদায় হলো। আমার স্ত্রী অতি বিরক্তির সঙ্গে ওটা বানিয়ে দিল।

এ কয়দিনে রহমানের ভিটেমাটি নিজের স্ত্রী-সন্তান না থাকায় ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে। রহমানের স্বভাব ওদেরও অজানা নয়, তাই যত দ্রুত পারে সম্পত্তি দখলের কাজটি সেরে ফেলেছে।

যে সকল পাওনাদার রহমানকে বিষণ্ন মনে মাপ করে দিয়েছিল, তারা আবার ধরনা ধরছে পাওনা প্রাপ্তির জন্য। রহমান এসে আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে গেছে। ধারের টাকায় কিছু ধার শোধ দেবে।

ঐদিকে রহমানের উত্থানের খবরে শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে। আশপাশের গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা এসে রহমানের সঙ্গে সেলফি তুলে ফেসবুকে দিচ্ছে। কবরে মুনকার ও নাকিরে সওয়াল জবাবের বিষয়েও জানতে চাচ্ছে কেউ কেউ। রহমান খালি হাসছে। দলে দলে সাংবাদিক আসতে শুরু করেছেন। দফায় দফায় সাক্ষাৎকার নিচ্ছে গ্রামের লোকজনের। সুবিধাজনক কোনো তথ্য বের করতে পারছে না কারো মুখ থেকে। যে যার মতো ছেপে দিচ্ছে খবর। একটা পেপার লিখেছে, 'দজ্জাল নাকি নেক অলির উত্থান : রহস্যের ঘোর কাটছে না কিছুতেই!' আমার স্ত্রী সেই রাতের সামান্য চা বানানোর কাজকে কেচ্ছা বানিয়ে বেশ সেজেগুজে সাক্ষাৎকার দিয়ে বেড়াচ্ছে টেলিভিশনে। একটা সাক্ষাৎকারে ওকে বলতে শুনলাম, রহমান সেদিন রাতে যখন আমাদের বাড়িতে এলো, তখন পুরো বাড়িটা টিউবলাইটের মতো জ্বলে উঠল। রহমানের শরীরে পবিত্র কাবাশরিফের ছায়া পড়েছিল। চা খাওয়া শেষ করে কাপটা টেবিলে রাখা মাত্রই চোখের সামনে উবে গেল। পরদিন দেখলাম রহমান যে সোফায় বসেছিল সেটি চেনা-অচেনা লোকজন দেখার জন্য ভিড় জমালে ও ওজু ছাড়া কাউকে উঠতে দিচ্ছে না ঘরে।

রহমানের কাছ থেকে পানিপড়া নিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে হাজার হাজার মানুষ। রহমান পানিতে ফুঁ দেবে না কিছুতেই। মানুষজন বাধ্য হয়ে রহমান উত্থানের পর প্রথম যে পুকুরে গোসল করেছিল সেই পুকুরের পানি এখন পান করছে, নিয়ে যাচ্ছে বোতলে করে। পুকুরের পানির দশা বেহাল দেখে লিটারপ্রতি দশ টাকা করে নিচ্ছেন পুকুরের মালিক রহিম মোল্লা। রহিম মোল্লার ছোটভাই রবমোল্লা জনগণকে তার পুকুর দেখিয়ে বলছেন, বাবা হজরত রহমান এই পুকুরেই দ্বিতীয় দিন গোসল করেছেন। সুবাহাল্লাহ! আসেন লিটারপ্রতি মাত্র পাঁচ টাকা! শহর থেকে সরকারি লোক এসেছে ভ্যাট নিশ্চিত করতে।

এর মধ্যে পানিপড়া নিতে আসা একটি বাস গ্রামের সরু রাস্তা ধরে আসার সময় খাদে পড়ায় জনাবিশেক মানুষ ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছে। এদের বেশিরভাগই সুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী আত্মীয়-স্বজনদের জন্য পানিপড়া নিতে এসেছিল।

গ্রামের উত্তর দিকের ফাঁকা জায়গাটিতে মেলা বসেছে। মেলা স্পন্সর করছে দেশের বৃহৎ একটি মোবাইল কোম্পানি। মেলায় বিক্রি হচ্ছে জিলিপি, পেঁয়াজি, চপ, শিঙাড়া ও হাতপাখা। আর অবশ্যই পানি। মানুষজন প্রথমেই যে জিনিসটি কিনছে তা হলো হাতপাখা। এই গরমে এটার গুরুত্ব বেড়ে গেছে বহুগুণে, সঙ্গে দামও। হাতপাখার ব্যবসা করেই জনাকয়েক পরিবার পাকা ঘর তুলে ফেলতে পারবে। যারা দিনে দিনে বাড়ি ফিরে যেতে পারছে না, তারা আশ্রয় নিয়েছে গ্রামের স্কুলের ছাদ ও বারান্দায়। সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে বিদ্যাপীঠ। এ কয়দিনে হালকা বসতিপূর্ণ প্রান্তিক গ্রামটি জেলা শহরের কোলাহলকেও হার মানিয়েছে যেন!

এমপি এসেছিলেন দলের নেতাকর্মী ও সংবাদকর্মীদের নিয়ে। রহমানকে পাশের চেয়ারে বসিয়ে নিজে লম্বা বক্তৃতা দিলেন। এমপি মহোদয় পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বিশেষ থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। তিনি বললেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিস্ময়কর নজির কেবল তার সরকারের আমলেই দেখা গেল। সরকার দেশে ধর্মীয় যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানসম্মত ধর্মশিক্ষা নিশ্চিত করেছে বলেই মহান আল্লাহ রহমানের মাধ্যমে তার খুশি হওয়ার বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, এক মাসের মধ্যেই গ্রামের রাস্তাঘাট আরও উন্নত করে দেওয়া হবে।

সরকারদলীয় সভা শেষ হওয়ার পরদিনই বিরোধী দলের কয়েকজন নেতা গ্রামে এসেছিলেন কিন্তু প্রশাসন এবং সরকারদলীয় ছাত্রনেতারা গ্রামে তাদের ঢুকতে দেয়নি। পরে শহরে ফিরে গিয়ে তারা বলেছেন, সরকার তার ব্যর্থতা থেকে দেশের জনগণকে মুখ ফেরানোর জন্যই এই নাটক সাজিয়েছে। সরকারের ব্যর্থতার কথা জনগণের জানা। নকল রহমানকে দিয়ে সরকার আবারও প্রমাণ করল, এদেশে ইসলামের প্রকৃত সেবী তারা নন। তারা ধর্মের নামে কুফরি করে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চোখে ধুলো দিতে পারবে না।

আমি বাড়ি বসে ইউটিউবে রহমানকে নিয়ে কয়েকজন মওলানার ওয়াজ শুনছিলাম। রহমানের পুনরুত্থান ইহুদি নাসারা ও নাস্তিকদের জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন একজন। অন্য একজন রহমানের উত্থানের আগেই তার সঙ্গে স্বপ্নে কথা হয়েছিল বলে জানালেন। স্বপ্নে রহমান তাকে বলেন, বাংলাদেশের নারীরা তাদের পশ্চিমা

টাইটফিটিং পোশাকে এদেশের পুরুষদের গুমরার পথে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষকে হেদায়েতের পথে আনতে হলে নারীদের ভার্সিটি যাওয়া বন্ধ করতে হবে। সহি পোশাকে মাদরাসায় পাঠাতে হবে। আরেক হুজুর তার ওয়াজে বললেন, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর গজব নামবে, রহমান আমাদের সতর্ক করতে ফিরে এসেছে। এখনো সময় আছে, পৃথিবীর অমুসলিমদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদে যেতে হবে। আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে হজরত রহমান আমাদের এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন।

ফেসবুকে দেখলাম, কুষ্টিয়ার লালন শাহ মাজারের কয়েকজন বাউল দাবি করেছেন রহমানের বেশে আসলে সাঁইজি উঠে এসেছেন। তারা বলছেন, এই মাজার থেকে সাঁইজি জানিয়েছেন যে তিনি পৃথিবীর মানুষকে জাতধর্ম ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে দাড় করাতে আবার উঠে আসবেন। তিনি পুনরুত্থানের রাতেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেছেন। বলতে বলতে জয় গুরু বলে গেয়ে ওঠে: ত্রিজগতের মূলাধার সাঁই/ জন্ম-মৃত্যু তার কিছুই নাই/ সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তাই/ থাক সদায় ঠিক জেনে।।

যাকে নিয়ে এত কথা, এত উৎসব ও আয়োজন, সেই রহমানই হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেল। এলাকা তন্নতন্ন করে কোথাও হদিস মিলল না তার। মাঝরাতে কে কোথায় দেখেছে সেই গল্প শোনা যেত প্রতিদিন। কোনোদিন হয়তো ফজরের আজান দিতে গিয়ে কেউ মসজিদে দেখেছে বলে জানাল। গনগনে দুপুরে মাঠে শ্যালো মেশিনের শীতল পানিতে গোসল করতে দেখল কেউ। কেউ দেখল মধ্যরাতে বাড়ির উপর দিয়ে পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে দীর্ঘদেহী রহমান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছিল। রাজধানীতে একজন পকেটমার জানিয়েছে, সে রাতে একজনের পকেটমারতে গেলে রহমান এসে তার পা ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। সত্যি সত্যি তার ডান পা-টা ভাঙা অবস্থায় পুলিশ তাকে উদ্ধার করেছে। এই ঘটনার পর নাকি দেশের অপরাধ অনেকটাই কমে গেছে।

আমরা যখন রহমানকে আর কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে তার সর্বময় উপস্থিতির নানা কাহিনি শুনতে পাচ্ছিলাম বিভিন্ন মাধ্যমে তখনই এক মধ্যরাতে রহমান আমার বাড়িতে হাজির। এবার আমার স্ত্রী

বেশ আগ্রহের সঙ্গে চা বানাতে গেল। কানে কানে বলে গেল টেবিলের পানিভর্তি জগে ফুঁ দিয়ে নিতে। চা আসার আগেই রহমান উঠে গেল। বলল— ক্লান্ত, বিশ্রামের দরকার। কবর পর্যন্ত আমি এগিয়ে দিলাম।

পরদিন জানাজানি হলে রহমানের কবর পাকা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল একটি মহল। রহমান যাতে আর সটকে আসতে না পারে তার জন্যই এই বন্দোবস্ত এমনটি ভেবে অন্য একটি মহল লাঠিসোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কবরের চারপাশে।

আমার স্ত্রীর এখন পেটের পীড়া একদম সেরে গেছে। ওকে বলা হয়নি, পানিতে ফুঁ-টা সেদিন আমিই দিয়েছিলাম।

করোনা, মৃত্যুর আগে এবং পরে

মৃত্যুর আগে

অদ্ভুত নেশায় পড়ে গেছি। রোজ দুপুর আড়াইটায় ব্রিফিং। আমরা একটার সময় বেটিংয়ে বসি। দিনরাত আমরা অপেক্ষা করি এই সময়টার জন্য। এখন আর বার কিংবা তারিখের হিসাব না করলেও চলে, কিন্তু সময়ের হিসাবটা এই কারণে আমাদের করতে হয়।

আজ দশ হাজার। ইলা বলে।

নয় হাজার। আমি বলি।

নিয়ম অনুযায়ী দুজনের সংখ্যার ভেতর ন্যূনতম এক হাজার দূরত্ব থাকতে হবে। ঘোষিত সংখ্যার সঙ্গে যার সংখ্যা সবচেয়ে কাছে থাকবে সে জয়ী। আমরা ১টা থেকে বসে থাকি টেলিভিশনের সামনে। চাইলে সারাদিন বসে থাকতে পারি এক চেয়ারে। এখন আর আমাদের কোনো কাজ নেই। আড়াইটায় ব্রিফিং। ১টা থেকে ২টার মধ্যে তিনবার পরিবর্তন করা যাবে।

বারো হাজার। ইলা আধা ঘণ্টা পর সংখ্যা বদলে ফেলে।

এগারো হাজার। আমিও আরেকটু তুলে দিই।

ব্রিফিংয়ে ঘোষণা করা হলো, আজকের সংখ্যা বারো হাজার পাঁচশ। ইলাই জেতে। খেলার রীতি অনুযায়ী ইলা এবং আমি দুজনেই ফেসবুকে ফলাফলটা জানিয়ে দিই।

খেলাটা দারুণ জমে উঠেছে। ইলা দশ, আমি নয়। তার মানে আমরা উনিশ দিন ধরে টানা খেলছি।

পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশ। ইলা আজ বলে। সংখ্যাটা এভাবেই বাড়ছে।

চল্লিশ হাজার। আমার মনে হয় অতটা বাড়বে না।

না, পঞ্চাশ হাজার। ইলা দশ মিনিট পরেই সংখ্যাটা বদলে ফেলে।

আমি স্থির থাকি আগের ঘোষণাতেই।

পঞ্চান্ন হাজার। ইলা শেষ মুহূর্তে আরো বাড়িয়ে দেয়।

ওর আত্মবিশ্বাসের কারণে আমি আর অনড় থাকতে পারি না। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে চলে যাই।

আজ ঘোষিত হয়েছে পঞ্চাশ হাজার।

দুজনের মাঝামাঝি। ফলাফল ড্র। আমরা ফেসবুকে জানাই সেটি। আমাদের দুজনের মধ্যে কে জিতবে সেটি নিয়ে ফেসবুকে বন্ধুদের কয়েকজন বেটিং শুরু করেছেন। ওরাও সমানভাবে উত্তেজিত।

বাজি ধরার খেলাটা আমাদের পাগল করে তুলেছে। আমরা দুজনেই জেতার জন্য মরিয়া এখন। দিনরাত মোবাইলে ক্যালকুলেটর খুলে আগের সংখ্যাগুলোর অগ্রগতি হিসাব করে আজকের সম্ভাব্য সংখ্যাটা বের করার চেষ্টা করি। শুরুর মতো মনগড়া বা অনুমানের ভিত্তিতে কোনো সংখ্যা দুম করে বলে বসি না। যেটা বলি তার পেছনে শক্ত যুক্তি থাকে। আমি রাজনীতি বেশি বুঝলেও গণিতে ভালো ইলাই। ভয়টা ওখানেই।

কাল থেকে কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্টটা আরো বেড়েছে। দুজনেরই। আমার ডায়াবেটিস। ইলার হার্ট-সার্জারি, কিডনির সমস্যাও আছে। কাজ হবে না জেনেও আমরা হেল্পলাইনে ফোন দিতে বাধ্য হই। একজন তরুণ ডাক্তার বয়স এবং অন্যসব জটিলতা শুনে বলে— দুঃখিত, আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। আমাদের সংগ্রহের শেষ কিটটার ব্যবহার হয়ে গেছে একটু আগেই। তাছাড়া, এখানে আর কোনো বেড খালি নেই। তরুণ ডাক্তার থামেন। একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে মোবাইল কল সেন্টারের কৃত্রিম স্বরের মতো মুখস্ত বলে যান, আপনারা বের হবেন না ঘর থেকে। নিজেদের মধ্যে যতটা সম্ভব সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, ঘন ঘন হাত ধোবেন, আর অবশ্যই প্রার্থনা করুন।

ভালোই হলো। আলাদা ওয়ার্ড বা কেবিনে দিত, বেটিংটা করা হতো না। ইলা বলে।

আমার শ্বাসকষ্ট বাড়ে।

ইলারও শ্বাসকষ্ট বাড়ে।

আরো বাড়ে।

আরো বাড়ে।
আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।
ইলার দম বন্ধ হয়ে আসে।
আমরা অপেক্ষা করি ব্রিফিংয়ের।
ফেসবুকে বন্ধুরা অপেক্ষা করে আমাদের স্ট্যাটাসের।
খেলাটা সত্যিই জমে উঠেছে।

মৃত্যুর পরে

আমরা গোল হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিলাম। শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ। ইহলোক এবং পরলোকের মাঝে, শূন্য এক স্থানে। এখানে কেউ বেশিক্ষণ থাকে না। আমাদের মৃত্যুর কারণ শেষবারের মতো মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এরপর আমরা চলে যাব মর্ত্যলোকের বাইরে, কালহীন এবং স্থানহীনতার মাঝে। অনস্তিত্বের মাঝে ঝুলে থাকবে আমাদের অস্তিত্ব।

কীভাবে? সামনের জনকে জিজ্ঞাসা করল অদৃশ্য এক কণ্ঠস্বর। অদৃশ্য হলেও তিনি তার কণ্ঠস্বর দিয়ে নিজের অবয়ব বোঝাতে সক্ষম ছিলেন।

ক্রসফায়ার। লোকটি একশব্দে উত্তর দেয়। মাথাটা উড়ে গেছে, তবু কথা বলতে অসুবিধা হয় না।

বিশেষ কারণ? প্রশ্নকর্তা জানতে চান।

মাদক। না, সম্ভবত চোরাচালান। একজন বলেছিল, দাড়ি আছে, জঙ্গিনেতা হিসেবেও চালিয়ে দেওয়া যায়। লোকটি জবাব দেয়।

কিন্তু এর কোনোটিই তো সত্য নয়! তুমি লেখক। এমন কিছু লিখেছিলে যা ওদের পছন্দ হয়নি? প্রশ্নকর্তা বলেন।

আপনি নিশ্চয় ডেথ সার্টিফিকেটে বিশ্বাস করেন? দেশের নামকরা ডাক্তারের সিগনেচার আছে সেখানে। খবরের কাগজগুলোতেও লেখা আছে। ক্রসফায়ার। কারণ নিয়ে আজকাল আর কেউ কথা বলে না। যে কারণেই হোক মানুষ মরছে। হত্যাও এখন স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে গণ্য। আমি এই কারণে মনে রাখার প্রয়োজন মনে করিনি। লোকটি বলে অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে নেয়। মাথা নেই বলেই সে ইচ্ছা মতো ঘোরাতে পারে। তার মাথা ঘুরতেই থাকে। যখন কোনো কিছু একতালে ঘুরতে থাকে তখন তাকে স্থির বলে মনে হয়। অথবা স্থিরও হতে পারে। এখানে

অনেক কিছু ঠিক মতো বোঝা যায় না। স্বপ্নের মতো অনেকগুলো দৃষ্টি তৈরি হয়। বস্তুর অসম্ভব সম্ভাবনা জেগে ওঠে। কিন্তু আমরা কেউই স্বপ্ন দেখছি না। আমরা জেগে আছি স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মাঝামাঝি একটা স্তরে।

আপনার? আমার বাঁ পাশে সামান্য দূরে এক লোকের কাছে জানতে চাওয়া হয়।

অনাহার। লোকটি বলে। শরীরের অর্ধেকটা কাটা। হাত দিয়ে ধরে আছে যাতে অন্য শরীরে মিশে না যায়।

শরীরের মায়াটা এ পর্যন্তই। এরপর আমরা যেখানে যাব সেখানে শরীরটা পোশাকের মতো খুলে রাখা হবে। যাকে কেন্দ্র করে দুনিয়া সেই শরীরটা এখানে থাকবে না। শরীর থাকলে পাপ থাকবেই, ঈশ্বরের চেয়ে কে বেশি ভালো বোঝে! ঈশ্বর কি নিরাকার এই কারণে? তার কখনো দেহ ছিল কি না কে জানে!

কিন্তু তোমার শরীর তো ট্রেনে কাটা? প্রশ্নকর্তা বলেন।

ট্রেনের কোনো দোষ ছিল না। আমরাই লাফ দিয়েছি—অনেক ভেবেচিন্তে, যদিও অত ভাবনার প্রয়োজন ছিল না, মরতে আমাদের হতোই। আমাদের মৃত্যু হয়েছে ক্ষুধায়। অনাহারে। বলে লোকটি এবার তার পাশের কিশোরীকে দেখায়। কিশোরীর শরীরটাও মাঝামাঝি চিরে গেছে, তবে লোকটির মতো লম্বালম্বি না, আড়াআড়ি। দড়ি দিয়ে বাঁধা। যারা দাফন করেছে একক কিংবা গণকবরে তারাই যত্ন করে বেঁধে দিয়েছে। আজকাল মৃতদেহের এমন যত্ন কেউ করে না। মেয়েটির কপাল ভালো বলতে হবে।

অনাহারে কেন? পর্যাপ্ত ত্রাণ ছিল। সরকার দিয়েছে, সংগঠন দিয়েছে, স্বেচ্ছাসেবক দিয়েছে। অন্য কোনো কারণ ছিল? প্রশ্নকর্তা কিছুটা আনমনা হয়ে জানতে চান। তার জিজ্ঞাসার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে সবই ঠিকঠিক লেখা আছে তার অদৃশ্য ফাইলে, তবু তিনি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে চাচ্ছেন না।

আমাদের নাম হয়তো কারো তালিকায় ছিল না। হতে পারে যার তালিকায় ছিল তার গোডাউনে এখনো বস্তাবন্দি আছে, কোনো একটা দিন অন্ধকারে সেই বস্তা খোলা হবে। হতে পারে আমরা পৃথিবীতে অদৃশ্য ছিলাম, আপনি যেমন এখানে অদৃশ্য। কিন্তু আপনি আছেন, এটা তো

আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না! আপনার ক্ষুধা আছে? ক্ষুধা না থাকলে আপনি নেই। লোকটির প্রশ্ন করে।

প্রশ্নকর্তা কোনো জবাব না দিয়ে পাশের মেয়েটিকে বাদ দিয়ে এপাশে আসেন।

কারণ? তিনি এবার প্রশ্ন করেন বৃদ্ধলোকটিকে।

করোনা। বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন।

কিন্তু আপনার তো লো প্রেশার। কিডনির সমস্যা। বয়সের কারণে আরো অনেক জটিলতা আছে। তাছাড়া মৃত্যুর সময় করোনার কোনো উপসর্গ ছিল না আপনার শরীরে। প্রশ্নকর্তা ধরিয়ে দেন। আপনি কি ভুলে গেছেন?

না, আমি কিচ্ছু ভুলিনি। বরঞ্চ এখন আমার স্মৃতিশক্তি আরো বেশি প্রখর। আমার মৃত্যু হয়েছে করোনার কারণেই। শহরের সাতটি হাসপাতালের কেউ ভর্তি করেনি। অ্যাম্বুলেন্সে সারাদিন কেটে গেছে এ-হাসপাতাল ও-হাসপাতাল করে। আপনি করোনা-ই লিখবেন। বৃদ্ধকে খুব একরোখা বলে মনে হয়। প্রশ্নকর্তা আর কোনো প্রশ্ন না করে সরে আসেন আমার দিকে।

আপনি? প্রশ্ন করেন। সম্ভবত আমাকেই। আমি কিছু বলে ওঠার আগেই পেছনের অল্পবয়সী ছেলেটা উত্তর দিতে যায়। আমি তখনো আমার মৃত্যুর পেছনে বলার মতো উপযুক্ত কারণ খুঁজে পাইনি। তাই আরেকটু সময় পেয়ে খুশি হই।

করোনা। ছেলেটা আগের বৃদ্ধলোকটির মতো উত্তর দেয়।

কিন্তু তোমার মাথায় লাঠির বাড়ি। লাঠিটা ভেঙে যাওয়ার পর একজন রড দিয়ে মেরেছে। প্রশ্নকর্তা বলেন।

আমাদের মধ্যে তর্ক বেধেছিল। আমি বলেছিলাম মসজিদের ভেতরেও করোনা ছড়াতে পারে। মহামারির সময়টা বাড়িতে নামাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। ওরা বলেছিল, করোনা আল্লাহর সৈনিক। ইমান থাকলে ওসব হবে না। এরপর ওরা ইমানি পরীক্ষায় আরো পাকা প্রমাণ করার জন্য ছুটে এসেছিল রড কিংবা লাঠি নিয়ে। আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম। এরপর আর আমার কিছু মনে পড়ছে না। ছেলেটার কথা শুনতে শুনতে প্রশ্নকর্তা এগিয়ে আসেন।

আপনি? প্রশ্নটা এবার সরাসরি আমাকেই করেন।

আমি চুপ করে থাকি। আমার শরীরে কোনো ক্ষত নেই। আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে বুঝতে পেরেছি প্রশ্নকর্তার কোনো কিছুই অজানা নয়। আমাকে তাই মৃত্যুর পরও নিজের মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে ভাবতে হয়। একবার ভাবি প্রশ্নকর্তার কাছেই আমি আমার মৃত্যুর কারণটা জানতে চাই। বেয়াদবি হতে পারে ভেবে সাহস করে উঠতে পারি না। তাছাড়া একজন মানুষ তার মৃত্যুর কারণ জানে না, এটা কি অন্যদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে!

তাড়াতাড়ি? লক্ষ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছে এই শূন্য স্থানে। প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার যোগ হচ্ছে। এত সময় আমরা দিতে পারব না। প্রশ্নকর্তাকে বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত বলে মনে হয়।

আমার মৃত্যুর আগে পৃথিবীর শেষ কিটটার ব্যবহার হয়ে গেছে। আমি বলি। আমার কথা শুনে কিংবা না শুনেই প্রশ্নকর্তা সরে গেলেন। তার অদৃশ্য চলন দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি চলে গেছেন আপনার কাছে। আপনি এতক্ষণ আমার ডান পাশে বসে ছিলেন। একটু দূরে, মাথা নিচু করে। এতক্ষণ প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতাদের কথাগুলো শুনছিলেন। এখন আর এই আখেরি সম্মেলন এবং সওয়াল-জবাবের কোনো কিছুই আপনার অজানা নয়। আপনি সম্ভবত অপেক্ষায়ই করছিলেন। আপনি হয়তো আপনার মৃত্যুর কারণটা জানেন কিংবা মনে করার চেষ্টা করছেন। আপনার মৃত্যুর কারণ জানার ব্যাপারে এখানে এই মৃতদের মধ্যে কারো কোনো আগ্রহ নেই জেনেও আপনাকে এখন সেটা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

আপনি কীভাবে? প্রশ্নকর্তা এবার আপনার কাছে জানতে চাইল।

আপনাকে এখন উত্তরটা দিতে হবে।

মেন্টাল

লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে পেছন থেকে আমার হাতটা চেপে ধরল। চমকে ওঠা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আমি এতটাই অন্য মনস্ক ছিলাম যে, পুরো বিষয়টা বুঝে নিতে কিছুটা সময় লাগল। লোকটা আমার হাত তখনো ছাড়ে নি। এত হাঁপাচ্ছেন যেন কিছু বলতে গিয়েও পারছেন না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমার ভয় পাওয়া বা ঘাবড়ে যাওয়া উচিত। আজকাল কতভাবে যে ক্রাইম হচ্ছে তার কি হিসাব আছে! প্রতিনিয়ত অপরাধীরা অপরাধের নতুন নতুন কলাকৌশল বের করে ফেলছে। সেদিনই আমার ছেলে, সিনেমা নিয়ে পড়াশুনা করছে, ল্যাপটপ আর মোবাইল হারিয়ে এসে খাওয়ার টেবিলে বলল, মনে হচ্ছে এদেশে লেখক-নির্মাতাদের চেয়ে ছিনতাইকারীরা বেশি সৃজনশীল। ভুল মানুষগুলো ভুল জায়গায় চলে গেছে।

লোকটিকে ভালো মতো দেখার পর আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। বয়স পঞ্চাশের মতো। বাড়ির পোশাকে আছে। শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে মনে হলো। নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছে। আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিজেই তার হাত দুটো ধরলাম। বললাম, শান্ত হন। লম্বা করে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিন। আমার তাড়া আছে বটে কিন্তু কোথাও যাচ্ছি না আপনার কথা না শুনে।

কিন্তু আমার হাতে একটুও সময় নেই। লোকটি বলার সময় মুখ হা করে টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মনে হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাসের সমস্ত অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে।

আমার স্ত্রী—। বাক্য শেষ করলো না।

কী হয়েছে আপনার স্ত্রীর?

পাগল।

কে পাগল?

আমার স্ত্রী। মাথায় সমস্যা।

আচ্ছা। আপনি শান্ত হন। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার দেখাচ্ছেন?

ঠিক হবে না। আপনি আমার সঙ্গে চলেন। লোকটি আমার হাত ধরে রীতিমতো টানতে থাকেন।

কিন্তু আমি তো ডাক্তার না। আমি গিয়ে কী করব? আমি এবার শক্ত হয়ে দাঁড়াই।

আপনাকে যেতেই হবে। নাহলে ওকে বাঁচানো যাবে না। লোকটি এবার মনে হলো কেঁদেই ফেলবেন।

কী মুশকিল! কিন্তু আপনি তো আমাকে চেনেন না। আপনার স্ত্রীও চেনার কথা না। আমি গিয়ে কী করব?

আপনি বাঁচাবেন। ও আত্মহত্যা করছে। লোকটি এবার কাঁদছে। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। আমি না ধরলে পড়েই যেতো।

আত্মহত্যা করছে তো বাধা না দিয়ে আপনি আমাকে ধরে টানাটানি করছেন কেন? আপনি তো আজব মানুষ!

আমি একা দরজা ভাঙতে পারছি না। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। আমার স্ত্রীকে বাঁচাবেন। ওর মাথায় সমস্যা।

এতক্ষণে মনে হলো আমরা কথা বলে সময় নষ্ট করছি মাত্র। আমিই এবার লোকটিকে টানতে টানতে তার দেখানো পথ ধরে বাসার দিকে যেতে থাকলাম।

আত্মহত্যা কেন করছে?

এমনি। মাথায় সমস্যা। সবসময় আত্মহত্যা করে। লোকটি বললেন।

কিন্তু এভাবে তো প্রতিবার বাঁচানো মুশকিল।

হ্যাঁ। খুব মুশকিল। বোঝে না। মাথায় সমস্যা।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকি। চার তলায় বাসা। গেটে কিংবা সিঁড়িতে কাউকে পেলে ডেকে নেব ভেবেছিলাম, দরজা খুব শক্তও তো হতে পারে, কিন্তু পেলাম না। দূরত্ব সামান্য হলেও যে সময়টুকু এরইমধ্যে গেছে তাতে একজন মানুষের দশবার মরে যাওয়া সম্ভব।

মূল দরজায় ধাক্কা মারতেই খুলে গেল। প্রয়োজনের চেয়ে একটু জোরেই ধাক্কাটা দিয়েছি। ওপাশে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ এভাবে দরজা খুলে যাওয়ায় চমকে গেছেন। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আবার? আজই তিনবার হলো। তোমার অত্যাচারে পথের লোকজনই আমাদের পিটিয়ে মারবে! ভদ্রমহিলা বলতে বলতে আমার পেছন থেকে লোকটিতে ধরে নিয়ে চেয়ারে বসালেন। লোকটি তখন বাচ্চা ছেলের মতো টেবিলে কনুইয়ের উপর মাথা রেখে গ্লাসের একটা ঢাকনা নিয়ে খেলতে শুরু করলো। মনেই হলো না আমার সঙ্গে একটু আগেই তার কোনো কথা হয়েছে। একটা অল্পবয়সী ছেলে এসে লোকটার পায়ে শিকল বেঁধে দিল।

আমি নেমে আসব, ভদ্রমহিলা বললেন, আমার বড়ো ভাই; বিয়েই করে নি।

বেকারজীবনের অপঠিত গল্পটা

সাহিত্য সম্পাদক ফোন করে বলেছেন সাত দিনের মধ্যে একটা গল্প দিতে হবে। বিষয়ভিত্তিক গল্প। এবারের বিষয় বেকারত্ব। কোনোরকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়া বলে দিয়েছি পারব। বেকারত্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে আজ ঠিক পঞ্চম দিনের মাথায় আমার চাকরিটা গেল। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! এখন এই দুদিনে বেকার অবস্থায় আমাকে লিখতে হবে বেকারত্ব নিয়ে। আগেও বেকার আমি হয়েছি; কয়েকবার। এবারও যে খুব সহজে চাকরি হবে এমনটা ভাবছি না। পত্রিকা অফিসগুলো পাল্লা দিয়ে লোক ছাঁটাই করছে। অনলাইনে কপি-পেস্ট করেও আজকাল একটা দৈনিক দিব্যি চালিয়ে নেওয়া যায়। এক সময় বেতন বাড়ানোর জন্য হাউস পরিবর্তন করেছি, আর এখন হাউস পরিবর্তন করা মানেই বেতন কমা। তাও যদি জেনে যায় চাকরি নেই, তাহলে তো আমার কিছু বলার সুযোগই থাকবে না। এক মাস বা দু মাস চাকরি না থাকলেও আমি চালিয়ে নিতে পারব, ততটুকু সঞ্চয় আছে; কিন্তু এর বেশি হলে রুমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে। এর আগেও দুবার ওকে এরকম পরিস্থিতিতে পাঠিয়েছি। প্রথমবার মেয়েটার জন্ম হয়নি, বিয়ের মাস ছয়েক পর, দ্বিতীয়বার ইলা সবে হয়েছে। এখন ইলার বয়স পনেরো। মাধ্যমিকে পড়ে। চাইলেও এ অবস্থায় ওদের বাড়িতে পাঠানো সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় বাধা হলো ইলার নানা-নানি মানে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আর বেঁচে নেই। চাকরি হোক আর না-হোক মিলি আর ইলাকে ঢাকাতেই থাকতে হবে। কিন্তু এসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে, আপাতত আমাকে গল্পের একটা কাঠামো ঠিক করে নিতে হবে। এখনই যদি গল্পটা ভেবে নিতে পারি তাহলে বাসায় ফিরে

লিখতে সময় লাগবে না। হাতিরঝিলের পূর্বপাশে বসে ভাবি। মানিব্যাগটা আজ খালি, তাই কিছুক্ষণ বসে আবার হাঁটতে হবে বাসার পথে।

নিজের বেকার জীবনের কিছু ঘটনা লিখলে বেকারত্ব বিষয়ে গল্প একটা হয়ে যায়। বেকার জীবনের সব গল্প যে কষ্টের তাও না, কিছু কিছু মজার গল্পও আছে। এই মুহূর্তে মজার গল্পগুলো মনে পড়ছে না। চাকরিটা থাকলে হয়তো মনে পড়ত। বিপদে পড়লে সুখস্মৃতিগুলোও মুখ ফিরিয়ে নেয়। অবশ্য মনে পড়েও লাভ নেই। আমি নিজের জীবন থেকে কিছু লিখব না বলে ঠিক করেছি। নিজের জীবন নিয়ে এতবেশি লিখেছি যে, মাঝেমধ্যে অপরাধী মনে হয় নিজের কাছে। নিজস্ব কিছু দুঃখকষ্ট সবার থাকে, কিন্তু সেগুলো লিখে জনপ্রিয় হওয়ার কোনো মানে হয় না। যে জীবন নিজের তা অন্যের হবে কেন! লিখতে লিখতে জীবনের একটা গল্পও অবশিষ্ট নেই নিজের জন্য। কোনো-না-কোনো গল্পে কোনো-না-কোনো চরিত্রের মধ্যে নিজের জীবনটা যখন চলে যায় তখন আর নিজের জীবনের সেই অংশটা নিজের বলে দাবি করার সুযোগ থাকে না। গল্পে যা বলে ফেলেছি সেটা পরে বউকে বলতে গেলে বলেছে, ধুর, এটা তো তোমার গল্প! তোমার নিজের গল্প বলো। আমি আর তখন বউকে রাতের অন্ধকারে বারান্দায় বসে নিজের কোনো গল্প মনে করে বলতে পারিনি। গল্পকারের জীবনের সব গল্প উজাড়—এটা একরকমের ব্যর্থতা বলে এখন মনে হয়।

কেউ তো আমার গল্প ছিনতাই করেনি, আমি সেধেই দিয়ে দিয়েছি, বিনিময়ে লোকে আমাকে লেখক হিসেবে চিনেছে। এখন যখন কেউ আমাকে প্রশ্ন করে কীভাবে লেখক হওয়া যায়, আমি অনায়াসে বলে দিতে পারি, নিজের গল্পগুলো নিঃশর্তে অন্যের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারলে সম্ভব। কোনো গল্পই ধরে রাখা যাবে না। কেউ যদি পণ করে বসে, একটা লাইনও নিজের কথা লিখব না কোথাও, তার পক্ষে প্রতিবেদক হওয়া সম্ভব, লেখক হওয়া নয়। জীবনের শুরুতে এরকম সামান্য পণ আমার ছিল। ভেবেছিলাম মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, সবকিছু বিকিয়ে দিলেও নিজের জীবনটা ধরে রাখব। বাবা-মা, পরিবার, আপনজন এদের একান্ত যে জীবন, চার দেয়ালের ভেতর যে গল্পের চলাচল তা রাষ্ট্র হতে দেব না। কিন্তু আজ পেছনে তাকিয়ে দেখি, স্মৃতিজুড়ে খাঁখাঁ শূন্যতা। বেকার জীবনের কিছু কিছু গল্প হয়তো বাকি আছে, যেহেতু বেকার জীবন নিয়ে

কোনো গল্প বা উপন্যাস লিখিনি এখনো। এই কারণে এই গল্প লেখার আগে খুব সচেতন থাকতে হচ্ছে যেন সেগুলো চলে না আসে।

গল্পটা হবে অন্য কারো। অন্য কেউ বেকার হলো, তার গল্পটা বলতে হবে। তাকে নিজের কোনো গল্প দেব না। প্রথমেই চরিত্রের একটা নাম ভেবে নিই। রফিক। নামটা কমন। এ নামে দেশে কেউ-না-কেউ বেকার আছে। মেহেদীও হতে পারে। এটা আরও প্রচলিত নাম। কিন্তু মেহেদী নামে আমার এক বন্ধু আছে। গার্মেন্টিস কারখানার মালিক। এই নামের কেউ যে বেকার হতে পারে সেটি মনে আসে না ওর কারণে। রফিক নামটা রাখা যেতে পারে। মোটামুটি পাকা করে ফেলি।

না। রফিক নামটা আমার পছন্দ না। পেছন থেকে অপরিচিত একজন বলে। বয়স আমার চেয়ে কম হবে। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। জিন্সের প্যান্টের উপর লালরঙা কলারবিহীন ফতুয়া। এ ধরনের ফতুয়ার চল এখন উঠে গেছে। লোকটাকে মনে হয় সময় ফসকে এক লাফে পনেরো বিশ বছর পরে চলে এসেছে।

আপনাকে কি আমার চেনার কথা? আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাই।

আমার নামটা আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার। রফিক হলে আমি মানব না। নামটা আমার পছন্দ না। আপনি অন্য একটা নাম দিতে পারেন, শফিক হতে পারে, এটাও বেশ কমন, যদি কমন নাম নিতেই হয়। আর কমন না হলেও যদি চলে তবে আমার জীবনানন্দ নামটা খুব পছন্দের। জীবনানন্দ বেকার হয়ে রাজধানী শহরে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোনো চাকরি তিনি পাচ্ছেন না, গল্পটা নামের কারণেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এমনিতে বেকার জীবনের গল্প খুব একটা আকর্ষণীয় হওয়ার কথা না। লোকটি এমন করে কথার পিঠে কথা চড়িয়ে দেয় যে, আমি একটা বাক্যও মাঝে বলার সুযোগ পাই না।

আপনার পরিচয়টা ভাই? আমি এবার খুব কোমল সুরে বলি। এখানে নির্জন সন্ধ্যায় স্বর চড়া করার সাহস হয় না, কখন কে কোন মতলব নিয়ে আসে বলা যায় না।

আপনার গল্পের চরিত্র। বেকার জীবনে আছি। আমার গল্পটা আপনি লিখবেন। লোকটি বলে। এতক্ষণে বুঝতে পারছি। গল্প লেখার কথা ভাবতে-না-ভাবতেই চরিত্র এসে হাজির। আগে এমন হতো না, এখন

প্রায়ই হয়। কখনো কখনো চরিত্র এসে নিজেই তার গল্পটা লিখিয়ে নেয়। তারপর যখন প্রকাশ করব বলে খুঁজতে যাই, দেখি হারিয়ে ফেলেছি।

শফিক নামটা আমার পছন্দ হয় না, এই নামে একটা লোক ছিল গাঁয়ে, প্রায়ই আমার মায়ের কাছে আসত। এর বেশি বলা যাবে না। সম্পাদক বলে দিয়েছেন দৈনিকে প্রকাশিত গল্পে যৌনতার বিষয় থাকা যাবে না। আরও কিছু শর্ত আছে। গল্পটা হতে হবে দুই হাজার শব্দের মধ্যে। কোনো কঠিন শব্দ রাখা যাবে না। খুব সরলভাবে বলতে হবে যাতে কোনো সাহিত্যের অপাঠকও ভুল করে পড়ে ফেললে যেন জলের মতো বুঝে ফেলে। আর গল্পে কোনো মওলানা বা হাজি চরিত্র রাখা যাবে না। বিতর্কিত হতে পারে এমন কোনো বিষয় থাকবে না। লেখার সময় এগুলো মাথায় রাখতে হবে। আমি আপাতত নাম নিয়ে ভাবি। জীবনানন্দ হতে পারে।

আমার প্রিয় কবি না হলেও জীবনানন্দ নামটা থাক। আমি বলি।

প্রিয় নয় কেন? জীবনানন্দ আপনার প্রিয় কবি না, এটা লিখলে আপনার এই গল্প কোনো সম্পাদক ছাপবেন? বিশেষ করে সম্পাদক নিজে যদি কবি হন? লোকটি জানতে চায়।

আচ্ছা, ঠিক আছে, লাইনটা সম্পাদনার সময় ফেলে দেব। জীবনানন্দ নামটা ফাইনাল। আমি বলি। নামটা নির্ধারণ করতে পেরে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাই।

জীবনানন্দ, আপনি কি চাকরি হারিয়েছেন? আমি লোকটির কাছে জানতে চাই।

না, ছেড়েছি। জীবনে তিনটা প্রেম করেছি, কাউকে আমি ছাড়তে পারিনি, আমি ছেড়ে দেওয়ার আগেই ওরা আমাকে ছেড়ে গেছে। চাকরির ক্ষেত্রে এই ঝুঁকিটা নিতে চাইনি। আর একদিন দেরি করলেই অফিস আমাকে ছেড়ে দিত। জীবনে কিছু না কিছু নিজে ছেড়েছি ভাবতেই ভালো লাগে। জীবনানন্দ বলেন।

আপনি কি চাকরি ছাড়ার পর থেকে খুব কষ্টে আছেন? আমি জানতে চাই।

আপনার কি মনে হয়? আপনার যদি মনে হয় আমি কষ্টে আছি, তো, আমি কষ্টে আছি। আমি তো এখন আপনার গল্পের চরিত্র মাত্র। উনি বলেন।

চরিত্র হলেও আমি চাই আপনি নিজের কথা বলেন। গল্পটা আমরা শেয়ারে লিখি।

সেটা কীভাবে?

আপনি আপনার বেকার জীবনের কষ্টের কথা বলবেন, আমি লিখব। প্রয়োজন মতো পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নেব পরে। সেটি আপনার না জানলেও চলবে।

কিন্তু আমার তো কোনো কষ্ট নেই। মানে বেকার জীবনের কষ্ট তো আমার নেই। জীবনানন্দ বলেন।

কেন? সামনের মাস থেকে ঘরভাড়া আসবে কোথা থেকে? পরিবারের খাবার, অন্যান্য সব আয়োজন? আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাই।

আমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হয় না। বড়লোক বাবার একমাত্র সন্তান আমি। চাকরিটা ছিল শখের। ওরা ছাড়িয়ে দেওয়ার আগেই তাই ছেড়ে দিতে পেরেছি। আমার একটুও সমস্যা হয়নি সিদ্ধান্ত নিতে। চাকরি গেল এখন বাবার হোটেলে খেয়ে কিছুদিন দেশবিদেশ করে নেব। ভবিষ্যতে বাবার সবই তো আমার থাকবে। অত চিন্তা কিসের! তিনি বলেন।

আপনার স্ত্রী সন্তান? আমি জানতে চাই।

আছে। স্ত্রী একটা ব্যাংকের সিনিয়র কর্মকর্তা। দুটো ছেলে, বড়টা কানাডায় স্কলারশিপ নিয়ে গেছে, ছোটোটাও যাবে কিছুদিন পর। শেষ বয়সে আমারও যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

তাহলে আপনার বেকার জীবন নিয়ে আমি লিখতে পারব না। আমি কিছুটা হতাশ হয়ে জানিয়ে দিই।

কেন?

আপনার গল্প লিখলে সেটি দেশের আর সব বেকার জীবনের গল্প হবে না। আপনার যে গল্প সেটা আমাদের পাঠক খাবেও না। বড়লোক বেকারের গল্প পাঠক পড়বে কেন? বেকারের কষ্ট মানেই পরিবার খেতে পাচ্ছে না, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চিকিৎসা হচ্ছে না, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ হঠাৎ বন্ধ। এটাই আমাদের সামাজিক বাস্তবতা। এর বাইরে কিছু লিখলে বেকারদের অপমান করা হবে।

কিন্তু যেটা সকলের জীবনে ঘটে, সেটা জানার জন্য পাঠক আপনার গল্প পড়বে কেন? জীবনপাঠ কি আরও বিশ্বস্ত নয়? জীবনানন্দ জানতে চান।

পাঠক পড়বে কারণ নিজের ব্যথার জায়গাটা পাঠক খোঁচাতে পছন্দ করে। চুলকানি যার আছে সে বোঝে ওটা না থাকার কষ্ট। দেখবেন প্রত্যেক মানুষের প্রিয় বিষয় হলো তার নিজের ক্ষত, এক মুহূর্তের জন্যও আড়াল হতে দেয় না; কোনো না-কোনো ভাবে প্রকাশ করবেই। আমি বলি।

তাহলে যে আমি মানে কবি জীবনানন্দ লিখলেন, কে হায় হৃদয়খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে? তিনি বলেন।

ভুল লিখেছেন। এই কারণেই তো কবিকে আমি অপছন্দ করি। সকলেই হৃদয়খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে। এটা মানুষের কমন রোগ। আমরা প্রত্যেকে এই কারণে অসুস্থ।

কিন্তু আমার তো কোনো দুঃখ নেই। অন্তত বেকার জীবনের দুঃখ। আমার স্ত্রী সন্তান সুখে আছে। ফুর্তিতে আছে। ওদের বাজারের জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ভাবতে হয় না। বিদেশি পণ্য আসে, ভেজাল নিয়ে ভাবতে হয় না। রোগ হলে বিদেশ ভ্রমণটাও হয়ে যায়। চিন্তা করা মাত্রই প্রয়োজন মিটে যায়।

এই কারণে তো আপনি আমার গল্পের চরিত্র হতে পারবেন না। আমি বলি।

কেন? দুঃখ না-থাকা কি অপরাধ? সবার জীবন কোনো না-কোনো লেখক লিখে যান তার গল্পে। আমার জীবন নিয়ে কেউ লিখবে না? আমি বড়লোকের ছেলে, সদ্য বেকার, চাকরিটা ছেড়ে আনন্দ করছি— এটা গল্প হতে পারে না? একটা সমাজে যখন সকলে চাকরি গেলে কষ্ট পায়, সেখানে একজন চাকরি ছেড়ে আনন্দ পাচ্ছে, এটা কি গল্পের জন্য কম আকর্ষণীয় বিষয়? তার দৃঢ় জবাব।

আমাকে ভাবতে হবে। আমি মোটেও প্রস্তুত না। আমি লক্ষ্য করি, নিজের জীবন নিয়ে লিখতে চাই না, আবার যে জীবন আমার নয়, তা নিয়ে লিখতেও আমার আপত্তি। লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকি, একটা মানুষ চাকরি ছেড়ে আমার কাছে এসে নিজের গল্পটা লেখাতে চাচ্ছেন কিন্তু আমি তার গল্পটা ধরতে পারছি না। বেকারত্বের গল্প লিখতে হবে কিন্তু বড়লোকের সন্তানেরা বেকার হলেও বেকারত্বের কোনো গল্প তাদের থাকে কিনা আমার বুঝতে অসুবিধা হয়।

তাহলে আপনাকে ঘরভাড়া দিতে হয় না? ঘুরেফিরে সেই প্রশ্ন। প্রতিমাসে ঘরভাড়া দিতে দিতে মনটা আমার ছোটো হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করাতে লজ্জা পাই। যার বাবার ঢাকায় একাধিক ফ্ল্যাট, তাকে কেন বাড়িভাড়া নিয়ে ভাবতে হবে! সে তো উল্টো বাড়িভাড়া তুলবে মাসে মাসে।

ভাড়া মাসে মাসে দেওয়া আর তোলা কি এক বিষয় হলো! জীবনানন্দ বলেন।

আচ্ছা, প্রতি মাসে বাড়িভাড়া পেতে কেমন লাগে? এটা কোনো প্রশ্ন হলো, কিন্তু মুখ ফসকে বের হয়ে আসে। আমি বুঝতে পারি বেকারত্বের গল্প থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। সচেতনভাবে গল্পে ফেরার চেষ্টা করি।

আপনি কি কখনো কোনো বেকারকে ঘরভাড়া দিয়েছেন? আমি জানতে চাই।

ভালো মাইনে নিশ্চিত না করে ভাড়া দিই না। তবে এক ভাড়াটে একবার বেকার হয়েছে। ডেসটিনিতে কাজ করত, বন্ধ হয়ে গেলে বেকার হয়ে গেল।

বেচারা! তারপর কি ঘরভাড়া দিতে পারত নিয়ম করে? কতদিন পর ফের চাকরি পেল জানেন? আমি জানতে চাই।

দু মাস মতো দিতে পেরেছিল। আমার তখন হঠাৎই টাকার দরকার পড়ল, নিজে হাতে নিয়েছি বেতনটা।

আপনি কোনো বেকারের ঘরভাড়া সংগ্রহ করার সময় কখনো কি তার চোখের দিতে তাকিয়েছেন? আমি জানতে চাই।

না। আমি টাকাটা হাতে নিয়ে গুনেছি। প্রথমবার মাঝপথে ভুল করে ফেলেছিলাম। পরের বার দেখলাম ঠিক আছে। এক টাকাও কম দেয়নি।

এরপর কি তিনি নেমে গেলেন স্বেচ্ছায় না নামিয়ে দিলেন?

আমি কিছু বলিনি। লোকটা খুব ভদ্র ছিল। নামিয়ে দেওয়ার সুযোগ দিল না। আমার খুব ইচ্ছা ছিল, একজন ভাড়াটিয়াকে নামিয়ে দেব আমি নিজে। কিন্তু প্রতিবারই তারা আমি বলার আগেই নেমে গেছে। জীবনানন্দ বলেন।

আগে জানলে আপনার নাম জীবনানন্দ দিতাম না। তিনি এত বড়লোক ছিলেন না। তিনি বেকারের ঘরভাড়া তার সামনে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে একবারও না তাকিয়ে দু বার গুনতে পারতেন না। আপনাকে ভুল নাম দিয়েছি।

জীবনানন্দ নামটি যে জীবনানন্দের জন্য সঠিক ছিল তারই-বা প্রমাণ কী? আমরা সকলে যে ভুল নামে ভুল মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করে

যাচ্ছি না, তা কি আপনারা লেখকরা নিশ্চিত করে বলতে পারেন? লোকটি উত্তর দেয়।

আপনাদের তো প্রতিষ্ঠান আছে, কারবার আছে, কত লোকের চাকরি দেন; কখনো কি কোনো মানুষের চাকরি গেছে ক্যারিয়ারের মাঝপথে? আমি জানতে চাই।

একবার একজনের চাকরি খেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এক সড়ক দুর্ঘটনায় লোকটা পৃথিবী ছেড়েই চলে গেল! আমি সবসময় কাউকে না-কাউকে চাকরিচ্যুত করে দেখতে চেয়েছি কেমন লাগে কিন্তু যাদের টার্গেট করেছি তারা আগেই কোনো-না-কোনো কারণে চলে গেছে, অধিকাংশ চাকরি ছেড়ে, দু-একজন পরকালে।

যে লোকটা চাকরি ছেড়েছে কখনো তার কাছে জানতে চেয়েছেন সে কোনো ব্যবস্থা করে ছাড়ছে কি না কিংবা তার কয়েক মাস চলার মতো সঞ্চয় আছে কি না?

না। যে লোকটার চাকরি গেছে, আমাকে তার রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে ভাবতে হয়েছে। বেকার জীবনের কষ্ট আমি বুঝি না। কিন্তু জানি যোগ্য মানুষকে রিপ্লেস করা কত কষ্টের কাজ। সামান্য একটা দারোয়ান পোস্টের জন্য শত শত মানুষ আসে। যে লোকটা দাঁড়াতে পারে না সেও আসে। যার বয়স হয়েছে মৃত্যুর, সেও এসে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি চায়। কখনো কখনো নারীরাও চলে আসে সিকিউরিটি গার্ড হতে। একবার এক প্রেগন্যান্ট মহিলা এসে চাকরি চায়, আটতলা পর্যন্ত সিঁড়ি ধোয়া-মোছা করবে।

চাকরিটা দিয়েছিলেন?

না।

শেষ পর্যন্ত কোনো চাকরি কি পেয়েছিল?

জানি না। আরও অনেক গল্প জানি চাকরি না পেয়ে কিংবা ছেড়ে চলে যাওয়ার।

কিন্তু নিজে বেকার হয়েও আপনি একজন বেকারের গল্পটা বলতে পারবেন না। আমি বলি। আমাকে উঠে পড়তে হয়। পশ্চিম দিকে হাঁটা শুরু করি। পূর্বদিকে বাড়ির পথ। কিন্তু আজ পশ্চিম দিকে হাঁটতে আমার ভালো লাগছে। লোকটি আমার পেছনে পেছনে হাঁটেন।

আমি আপনার গল্প লিখতে পারব না। আমি বলি। আমাকে আমার গল্পই লিখতে হবে।

লোকটি তবু পেছনে পেছনে আসেন। রাস্তা সকলের, আমি কিছু বলতে পারি না।

আপনার কাছে কটা টাকা হবে? লোকটি আমার কাছে জানতে চান। আমি এবার না থেমে পারি না।

মেয়েটার জ্বর। নিশ্চয় ছেড়ে যাবে। ঔষধ না খেলেও কখনো কখনো জ্বর ছেড়ে যায়। কিন্তু দুধ না খেলে বাঁচবে না! তিনি বলেন। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। একজন বেকারের চোখের-মুখের ভাষা আমার চেনা।

জীবনানন্দ; আপনি গল্পের সেই জীবনানন্দ তো? আমি জানতে চাই।

না; অন্যকেউ। বাস্তবে আমি একজন শফিক অথবা একজন রফিক।

তাহলে জীবনানন্দ কে? কার গল্প ওটা? আমার বিস্ময় ও বিরক্তি দুটোই বাড়ে।

অন্য কেউ। আমি জানি না। রোজ রোজ একগল্প ভালো লাগে না। বলেছিলাম না, কে হায় হৃদয়খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে! অন্যগল্পের চরিত্র হতে চেয়েছি। এভাবে যদি জীবনের গল্পটা বদলে ফেলা যেত! বিপরীত চরিত্রে কেমন মানিয়েছে আমাকে? লোকটি জোর করে হেসে জানতে চান।

কিন্তু কেন? ভুল গল্পের নায়ক হবেন কেন? আমি বলি।

জীবন অদলবদল করতে চাই। আপনি লেখক, এটা করা আপনার কাজ। পারবেন আমারটা বদলে দিতে?

কিন্তু আপনাকে চাকরি পাইয়ে দিলে তো বেকার জীবনের গল্প লেখা হলো না? আমাকে বেকার জীবনের গল্প লিখে পাঠাতে হবে। হাজার দুয়েক টাকা পাবো এই চাকরি হারানো মাসে। অন্য গল্পের এখন প্রয়োজন নেই আমার।

চাকরির কথা বলছি না। বলছি, বেকারই থাকলাম, আমার অবস্থানটা বদলে দেন।

কীরকম? আমি জিজ্ঞাসা করি হাঁটতে হাঁটতে। পেছনে পেছনে হাঁটেন লোকটি।

যে রকম বললাম। ইচ্ছা করে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। বড়লোক বাবার একমাত্র সন্তান। স্ত্রী চাকরি করে, একটা ছেলে দেশের বাইরে, অন্যটাও যাবে। বলতে বলতে লোকটি খুব কাছে আসেন একবার। আমার শরীরের কোথাও ছোঁয়া লাগে তার। এরপর দ্রুত পায়ে হেঁটে যান আমাকে অতিক্রম করে। আমি তাকাতেই দৌড়ে ঢুকে পড়েন ডানের এক চিকন গলিতে। কী যেন ভেবে পকেটে হাত দিয়ে দেখি। ভাবি চিৎকার দিই পকেটমার বলে, তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে মানিব্যাগটা খালি, কয়েকটা অকেজো কার্ড পড়ে আছে শূন্যস্থান পূরণ করে।

ফের প্রতিযোগিতায় খরগোশ-কচ্ছপ

পৃথিবীর সবচেয়ে জানা গল্পটার জন্ম দিয়েছে এক খরগোশ আর এক কচ্ছপ। সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। কতদিন আগের কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল এবং তাতে খরগোশ পরাজিত হয়েছিল বলে সকলেই জানে। যেহেতু সকলেই জানে, তাই আর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না।

এ নিয়ে খরগোশদের মনে মহা অসন্তোষ। পৃথিবীর ইতিহাস—সে জঙ্গল হোক আর জল, কিংবা স্থল—সবখানেই একি নিয়ম, ইতিহাস লেখা হয় রচয়িতাদের সুবিধা বিবেচনা করে। খরগোশদের জোর ধারণা, এই দৌড় প্রতিযোগিতার কথা বিকৃতরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কচ্ছপ যে দৌড়াতে পারে না, এটা সকলেই জানে, সেটা যদি কোনো খরগোশ ঠাট্টার ছলে বলেই থাকে, অন্যায় বলেনি। এটা কোনো অহংকারের ব্যাপার না। রসবোধের সঙ্গে অহংবোধকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই 'অহংকার পতনের মূল' এই নীতিবাক্যের গল্পভাষ্য তৈরি করার জন্য যে নিম্নমানের গল্প ফাঁদা হয়েছে, তার মধ্যে চরমভাবে খরগোশ-বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ পায়। যদি সত্যি সত্যি এ ধরনের দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েই থাকে, তাহলে খরগোশই জিতেছে। দৌড় থামিয়ে কচ্ছপকে অবহেলা করে খরগোশ বিশ্রাম নিতে শুরু করেছে, এটা গায়ের জোরে বলা। যেন, ফলাফল পূর্ব-নির্ধারণ করে এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আর এরপর থেকে ঘটনার সত্যতা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন না তুলে খরগোশদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করেই যাচ্ছে। শুরুতে হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভেবে খরগোশরাও কিছু বলেনি। কিন্তু এখন সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনার সঙ্গে পুরো খরগোশ প্রজাতি জড়িয়ে পড়েছে। জঙ্গলে ইঁদুর পর্যন্ত কোনো খরগোশকে দেখলে স্মরণ

করিয়ে দেয় সেই ঐতিহাসিক এবং মিথিক পরাজয়ের কথা। যখনই কেউ কোনো কাজে খরগোশের সঙ্গে পেরে ওঠে না, তখন যে কোনো ছুতো খুঁজে কচ্ছপের কাছে হেরে যাওয়ার গল্পটা শুনিয়ে দেয়। কচ্ছপের ধৈর্য ও একাগ্রতা থাকতে পারে, তাই বলে সেটা প্রমাণ করার জন্য জঙ্গলে এত এত প্রাণী থাকতে খরগোশকে কেন টানা হলো? প্রশ্নটা এতদিনে উঠেছে। বিশ্বের সমস্ত খরগোশ তাদের অসামাজিক, মানে জঙ্গলিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ইভেন্ট খুলে প্রতিবাদ জানিয়েছে। শুধু প্রতিবাদ জানিয়ে থেমে থাকেনি, সঙ্গে একটা প্রস্তাবও জুড়ে দিয়েছে। তারা ফের রেস চায়। কচ্ছপের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে খরগোশ। আর সেটি লাইভ প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে ডিসকভারি চ্যানেলে। এমনিতেই জঙ্গলে ওদের ক্যামেরার অভাব নেই। জঙ্গলের প্রাইভেসি বলতে কিচ্ছু আর বাকি নেই! মানুষও সাক্ষী হবে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার। এবার নিশ্চয় খরগোশ ঘুমিয়ে পড়বে না; টানা দৌড়ে প্রচলিত ইতিহাস ভুল প্রমাণ করে ছাড়বে।

কিন্তু সহজে তো আর জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণীরা মানতে চায় না। যদি-বা খরগোশদের আন্দোলনের চাপে মেনে নিতে বাধ্য হলো তো বাদ সাধল কচ্ছপেরা। তারা কিছুতেই এই রেসে অংশ নেবে না। যে ঐতিহাসিক শিরোপা তারা কত শত বছর আগে পেয়েছে, সেটা কোনো অবস্থাতেই হারাতে চায় না। কিন্তু কচ্ছপদের মধ্যে একটা বিদ্রোহী দল আছে, যারা এই ঐতিহাসিক জয়কে আরোপিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করে। তারা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছে, আসলে তাদের দমিয়ে রাখার জন্যই অতি কৌশলে এই গল্প ফাঁদা হয়েছে। কচ্ছপদের ধীর কিন্তু মনোযোগী বলে আসলে কচ্ছপদের চিরকালের মতো অনগ্রসর করে দেওয়া হয়েছে। কচ্ছপরা গতিশীল না হয়েও শেষ পর্যন্ত জিতবেই, এই অতি-বিশ্বাস থেকে কচ্ছপরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কর্মবিমুখ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। অন্যদের বোকামির উপর ভর করে জয়ে কোনো আনন্দ নেই। জিততে হলে টক্কর দিয়েই জিততে হবে। আর সে ক্ষমতা কচ্ছপদের থাকুক আর না-থাকুক, তারা জিতেই প্রমাণ করবে তারা জয়ী। সুতরাং, কচ্ছপদের একটা বৃহৎ অংশের জোর দাবি, প্রতিযোগিতা আরেকবার হতেই পারে।

শেষ পর্যন্ত খরগোশ এবং কচ্ছপের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো।

খরগোশদের মধ্য থেকে এমন একজনকে নির্বাচন করা হলো যার স্মৃতিশক্তি প্রখর। দৌড়াতে একটু কম পারলেও ক্ষতি নেই। সকলেই জানে, কচ্ছপের সঙ্গে জিততে হলে কোনোমতে দৌড়ালেই হবে। কিন্তু পথে থামা যাবে না। যার স্মৃতিশক্তি প্রখর সে ভুল করেও এবার থামবে না।

কচ্ছপরাও তাদের মধ্য থেকে এমন একজনকে নির্বাচন করল যে টানা দৌড়াতে পারবে। গতি নিয়ে তারাও বেশি চিন্তিত না। সকলেই জানে সবচেয়ে দ্রুতগতির কচ্ছপও সবচেয়ে ধীরগতির খরগোশের সঙ্গে দৌড়ে হেরে যাবে। কিন্তু তার পরও কচ্ছপ জানে তারা জিতবে। তারা শত শত বছর ধরে জেনে আসছে তারা জিতেছে।

প্রতিযোগিতা যথারীতি যথাসময় শুরু হলো।

শিয়াল ডেকে উঠল হুক্কা হুয়া...

কচ্ছপ দৌড় শুরু করল। দৌড়চ্ছে খরগোশও। মুহূর্তে খরগোশ ছাড়িয়ে গেল কচ্ছপকে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই অসম দৌড় প্রতিযোগিতার অংশ হয়ে নিজেকে বোকা বোকা মনে হয় খরগোশের। কিন্তু এখন সেটি ভাবার সময় না। খরগোশ দৌড়াচ্ছে আর সশব্দে বলে যাচ্ছে, বিশ্রাম পরে, বিশ্রাম পরে, বিশ্রাম পরে। পাশের দর্শকসারি থেকে একটা শিয়াল বলে ওঠে, যত জোরেই দৌড়াও, লাভ নেই; কচ্ছপ জিতেই আছে। কিছুদূর এগিয়ে একটি হরিণ চেঁচিয়ে বলে, কোনো লাভ নেই, কচ্ছপ জিতেই আছে। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে মাথার উপর একটি পাখি উড়ে এসে বলে যায়, পাগলের মতো দৌড়ে কোনো লাভ হবে না, কচ্ছপ জিতেই আছে। খরগোশের মেজাজ চড়ে যায়, আরও উত্তেজিত উজ্জীবিত হয়ে দৌড়াতে থাকে।

ওদিকে, অনেক পেছনে, কচ্ছপ দৌড়াচ্ছে নির্বিঘ্নে, ধীরে ধীরে।

খরগোশ পৌঁছে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। এবার আর সে পথের মাঝখানে থেমে বিশ্রাম নেয়নি। ঘুমিয়ে পড়েনি। টানা দৌড়েছে। জয় তার হবেই। সীমারেখার দাগ ছুঁয়ে নিশ্চিত যখন হতে যাবে তখনই চোখে পড়ল গলায় মালা পরে দাঁড়িয়ে আছে কচ্ছপ। মুচকি হাসি লেগে আছে ওর সরু মুখে।

ফিনিশিং লাইন স্পর্শ না করে মন খারাপ করে ফিরে আসার পথে খরগোশটা দেখে, কচ্ছপ দৌড়াচ্ছে তখনও। সেই মুচকি হাসিটা ঝিলিক মেরে যায় ওর ঠোঁটে। কচ্ছপ হাসে, নিশ্চিন্ত হাসি।

সিসিফাস হাসে ঈশ্বরের হাসি

অবশেষে সিসিফাসের প্রার্থনা কবুল করলেন ঈশ্বর। শতশত বছর ধরে সে এই প্রার্থনা করে আসছে। প্রতিবারই পাথর কাঁধে তুলে ভেবেছে— এইবার বুঝি উঠে যাবে অনায়াসে। পাষাণ পাথরটা ওপাশে ফেলতে পারলেই সিসিফাসের মুক্তি। প্রতিবারই হতাশ হয়েছে। শেষ মুহূর্তে এসে বদমাশ পাথরটা ফসকে গেছে হাত থেকে। পাথরটি ঝড়ের গতিতে গড়াতে গড়াতে চলে এসেছে পাহাড়ের পাদমূলে।

পৃথিবীর কোনো মানুষই এত হতাশ হয়নি কখনও। ঈশ্বরকে গালি দিয়েছে—পৃথিবীর কোনো গালিই বাদ পড়েনি। আবার যখন নতুন করে শুরু করেছে— অনুতপ্ত হয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে ভাসিয়ে দিয়েছে শুকনো ভূমি। পৃথিবীর মানুষ আশ্চর্য হয়ে ভেবেছে, পাহাড়ের চোঙ্গা চূড়ায় এত জল ধরে কীভাবে! সিসিফাস এতবার ঈশ্বরের নাম জপেছে যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলেও পারেনি। তবুও ঈশ্বরের মন গলেনি। সিসিফাসের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

অবশেষে সিসিফাসকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। কেমন তুলার মতো বাতাসে ভর করে উঠে গেল পাথরটা। সবই হলো ঈশ্বরের ইশারায়, কৃপা তো বটেই। আজ থেকে সে তার জীবনের সম্পূর্ণ হকদার। তার কর্মফল এখন থেকে সে ভোগ করবে। ফল পাবে হাতেনাতে যেমনটি আর পাঁচটা মানুষ পায়। ঈশ্বরকে মানা না মানা তার মর্জি। সে ইচ্ছে করলেই কোনো কাজ মাঝপথে রেখেই চলে যেতে পারবে অন্য কোনো কাজে। কাজ যে করতেই হবে তারও কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই।

তবে ঈশ্বরেরও কিছু শর্ত আছে। সিসিফাসকে বলা হলো, তাকে মানুষের জীবনযাপন করতে হবে। এবং সে যেহেতু অভিশপ্ত তার কখনও

মৃত্যু হবে না। সিসিফাস তো বিনা-বাক্যে রাজি। বেশ আনন্দের সঙ্গে ঈশ্বরের সব শর্ত মেনে নিলো সে। মানুষের জীবন তো আর কম বহুরূপী নয়! হাজারো রকমের জীবন মানুষের—সবগুলো একটার পর একটা যাপন করতে করতেই কেটে যাবে তার মৃত্যুহীন অনন্ত জীবন।

সিসিফাস নেমে এলো মানুষের ভিড়ে। এখন তার সবকিছুতেই ভালো লাগছে। যা করছে তাতেই সে খুঁজে পাচ্ছে নতুন নতুন উদ্যম। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ে করা, সন্তান বড় করা, সন্তানের বিয়ে দেওয়া, জুম চাষ করা, অফিস-আদালতে কাজ করা, এই পুলিশ তো সেই চোর—কী করল না সে! কয়েকজীবন সে কাটিয়ে দিলো মহা আনন্দে। কিন্তু এ আনন্দেও ভাটা পড়ে একদিন। চোখের সামনে মানুষগুলো কেমন বড় হয়, বদলায় তারপর একসময় চলেও যায়। আবার আসে নতুন মানুষ। তারাও যায় একদিন। সিসিফাস থেকে যায়। মানুষ বুড়ো হয়, সিসিফাস বদলায় না। তার কাজও বদলায় না। সিসিফাস দেখতে পায়, সে পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে, মানুষগুলো একটার পর একটা আসছে যাচ্ছে। সিসিফাসও গড়াচ্ছে তাদের সাথে। গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই। সব মানুষই বিয়ে করে, কাজ করে, সন্তান হয়, সন্তান আবার সম্পূর্ণ মানুষ হয়, বুড়ো হয়, রোগ-শোক হয়, তারপর মারা যায়। আরও যা করে—খায়, হাগে, ঝগড়া করে, ভালোবাসে, নিয়ম করে ঘুমায়, নিয়ম করে জাগে—একই ছকে বাঁধা সব। দূর থেকে দেখলে সবাই এক একজন সিসিফাস।

তবে এরা অনেক বেশি ভাগ্যবান, কারণ এদের মৃত্যু আছে, ভোগান্তিরও আছে শেষ। আছে সবকিছু একপেশে হওয়ার আগেই সমাপ্তি। এজন্যই আছে সবকিছুতে এত উত্তেজনা! সিসিফাসের মৃত্যু নেই কাজেই অনন্তকাল কেবলই তার মানুষ মানুষ অভিনয় করে যাওয়া। মানুষদের দেখে খুব হিংসে হলো তার। আহ্! কী চমৎকার বেঁচে থাকা।

সিসিফাস ফের ঈশ্বরের কাছে ধরনা দিলো—এবার মৃত্যু চায় তার। হোক সে যত কষ্টের মৃত্যু। এবার তিনি সহজেই শুনলেন সিসিফাসের কথা। তবে যথারীতি একটা শর্ত জুড়ে দিলেন—বিনা শর্তে ঈশ্বর তো কিছু দেন না—এটা তাঁর ধর্মে নেই! তিনি বললেন, সিসিফাসকে মৃত্যুর পর মানুষের সঙ্গেই থাকতে হবে—স্বর্গ কিংবা নরকে—অনন্তকাল। একবার মৃত্যু হওয়া মানেই দ্বিতীয়বার মৃত্যুর সম্ভাবনা একেবারে নাকচ হয়ে যাওয়া। জীব মাত্রেই একবার জন্মে, একবার মরে। মৃত্যুর পরের যে

জীবন সেটা ঈশ্বরের মতোই মৃত্যুহীন। ক্ষয়হীন। ঈশ্বর চাইলেও আর মারতে পারবেন না কোনো জীবিত-মৃতকে, কেননা মৃত্যু দিয়েই অর্জন করা সে জীবন।

সব শোনার পর সিসিফাসের সমস্ত উচ্ছ্বাস নিমেষেই উবে গেল। সে স্বর্গ কিংবা নরক কোথাও যেতে চায় না। যে জীবন অনন্তকাল—একঘেয়ে, যার কোনো শেষ নেই, তার আবার স্বর্গ আর নরক কিসের! সিসিফাস শেষ চায়। সে চায় তার অস্তিত্ব শিশিরবিন্দুর মতো, ঝরা পাতার মতো, পাখির গানের মতো নেই হয়ে যাক চিরদিনের জন্য।

ঈশ্বর সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন—শেষ বলে কিছু তো নেই! থাকলে স্বয়ং ঈশ্বরই কয়েক কোটি বছর আগেই বলেছেন—আর ভাল লাগে না!

পাথর গড়াতেই থাকে...। সিসিফাস আর প্রার্থনা করে না। তার ভাবনায় ঈশ্বর আর সে একই নিয়মে বন্দি এখন। পাহাড়ের নিচে একজন একজন করে মানুষের মৃত্যু হয় আর সিসিফাস হাসে— ঈশ্বরের হাসি।

বিড়াল-পোস্টমর্টেম

আমাদের উল্লাস খুব ব্রেনি ছেলে। আবিষ্কারের নেশায় পাগলপ্রায়। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম সে বড়মাপের বিজ্ঞানী হতে চলেছে। একবার একটি বিড়াল ধরে কী কাণ্ডটাই না করল! এ রকম কাণ্ড সে আরও অনেক কিছু নিয়ে করেছে। বিড়ালকেন্দ্রিক ঘটনাটার বিবরণ দিলেই বাকিগুলো আন্দাজ করা যাবে। বিড়ালটি ছিল আমাদের পরিবারেরই একজন। জন্ম থেকে এ বাড়িতে আছে। রান্নাঘরের দেখভাল সে বেশ দায়িত্ব নিয়েই করে—তার উপস্থিতিতে অন্য কোনো বিড়ালের সাধ্য নেই রান্নাঘরে প্রবেশ করার। গবেষণার জন্য উল্লাস যখন বিড়ালটি বেছে নিল, বড় ভাবি, মানে উল্লাসের মা একটুও অমত হননি। তিনি বললেন— বেশ তো। অনেকদিন থেকে বাড়িতে আছে, যদি কোনো কাজে লাগে, লাগা। তবে দেখিস, ওর যেন ক্ষতি না হয়। বড়োভাই এক মিস্ত্রিকে ধরে এনে একটা জবরদস্ত খাঁচা বানিয়ে নিলেন। ছেলের আবিষ্কেরে স্বভাবের জন্য তিনি যারপরনাই খুশি। বন্ধুমহলে আনন্দের সাথে বলে বেড়াতেন, আমার উল্লাস এই করল, সেই করল! চাচা হিসেবে আমিই কী কম গল্প করি!

বিড়ালটি খাঁচায় নিয়ে প্রথমেই যা করল—এক মাস জামাই-আদর করে আপ্যায়ন করল। আমরাই ওর কথামতো বাজার থেকে এটা-সেটা কিনে এনে দিতাম। বসে বসে আয়েশ করে খেয়ে বিড়ালটি ছোটোখাটো বাঘের আকার ধারণ করল। খাঁচার ভেতরে সে কী আস্ফালন তার! একদিন উল্লাস আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলল— বিড়াল বাঘের ছোট ভাই— এইবার বিশ্বাস হয় তো? বিশ্বাস আগে থেকেই ছিল, সত্যি সত্যি এইবার অনুভব করলাম। আমার কথা শুনে উল্লাস বলল, ইঁদুরের সঙ্গেও একটা সম্পর্ক আছে, সেটা জানো তো? এইবার সেটা দেখাব তোমাদের।

আগামী এক মাস ওর খাবার বন্ধ। উল্লাসের মা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল— সেকি! মরে যাবে তো?

মা, তুমি যা বোঝো না তাই নিয়ে কথা বলতে এসো না। উল্লাস বলল। আমরা কেউ আর কোনো কথা না বাড়িয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেলাম। ও বড়ভাই-ভাবিকে তখন বুঝ দিচ্ছে— দেখো, বিড়ালটির কিচ্ছু হবে না। তাছাড়া হলে বা কী, নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রয়োজনে এমন দু-একটা কোরবানি দেওয়া নতুন কিছু না। লাইকার গল্পটি শোনোনি? ওই যে একটা কুকুরকে এক সপ্তাহের খাবার দিয়ে মহাশূন্যে পাঠানো হলো। কিছুদিন পরে সে তো মরলই। কিন্তু মাঝখান থেকে সে যে কাজটি করে গেল তার আন্দাজ আছে তোমার? সভ্যতার ইতিহাসে লাইকার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হলো। একটা কুকুরের ভাগ্যে এমনটি জোটে? তোমার-আমার ভাগ্যে জুটেছে? তার পরই বড়োভাইয়ের মাথায় বুদ্ধি এলো— আমাদের বিড়ালটার জুতসই একটা নাম রাখতে হবে। উল্লাস যদি সত্যি সত্যিই কিছু একটা করে বসে তাহলে তার সাথে সাথে বিড়ালটার নামও ফলাও করে প্রচারিত হবে।

আচ্ছা, উল্লাস আমাদের অনেক বড় হবে—না গো?

সে আর বলতে। এই হলো বলে। ভাই কণ্ঠ ভরাট করে উত্তর দিলেন। তারপর তারা খোশগল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আমরা যে যার কাজে ব্যস্ত, উল্লাস উল্লাসের। বড়ভাই কাস্টমসে চাকরি করেন, দু হাতে আয় তার। তাই ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কেউ ভাবি না। মাঝেমধ্যে অবসর পেলে আমি ওর রুমে ঢুঁ মেরে আসি। কখনও কখনও বলে— কাকু আসো, তোমাকে একটা নতুন আবিষ্কারের কথা বলি। বেশিরভাগ সময় বলত— কাকু, এখন বিরক্ত করো নাতো। অন্যসময় এসো।

এক মাস পর সে বিড়ালটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করল। বেঁচে আছে দেখেই বড় ভাবির আনন্দ যেন আঁটছে না। কিন্তু এ কেমন বেঁচে থাকা? বিড়ালটির শরীর শুকিয়ে একেবারে কাঠের জো অবস্থা। পাগুলো চড়ুই পাখির পায়ের মতো শুকনো। শরীরের হাড়গুলোর ওপর চামড়াটা কোনোমতে লেগে আছে। বিড়ালটির কিছুদিন আগের যে চেহারা সেটি কেউ না দেখলে তাকে ইঁদুরই মনে করবে। ইঁদুরের মতোই মাথাটা সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে গেছে।

জল-পানি কিছুই দিসনি নাকি? ভাবি জিজ্ঞেস করল।

ইঁদুরের পরীক্ষা শেষ। আরও পনেরো দিন টানা ও কিছুই খেতে পাবে না। তারপর ওকে দিয়ে আমি নতুন পরীক্ষা শুরু করব।

বাঁচবে তো?

মা বকবক করো না তো। যাও। তোমাদের কাজ শেষ।

সপ্তাখানেক পরের এক সকালে বিলুর মা চিল্লিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল। গিয়ে দেখি মাথায় হাত গিয়ে হায় হায় করছে। ফ্রিজের ডিপ খুলে মাংসের প্যাকেটটা সরাতেই দেখেছে মাংসপিণ্ডের মতো জমে বরফ হয়ে আছে বিড়ালটা। ভাবি ডেকে পাঠালেন উল্লাসকে। পাঁচ দিন ধরে বিড়ালটি ডিপে। বোঝো কাণ্ড! উল্লাস বের করে বলল— বিলুর মা, চুলায় একটু পানি চড়াও তো।

কী করবি? ভাবি জানতে চাইলেন।

একটু জ্বালালেই ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে নড়াচড়া করছে। উল্লাসকে বোঝায় এমন সাধ্য কার! ঘণ্টাখানেক জ্বালিয়ে রোদে শুকাতে দিল।

বিকেলে সবাইকে ছাদে ডেকে বলল— দেখো চিনতে পারো কি-না!

বিড়ালটা পিটপিট করে তাকাচ্ছে। গায়ে পশম বলতে নেই, লোম-ছেলা মুরগির মতো দেখাচ্ছে। গায়ে সেলাইয়ের দাগ দেখে মনে হলো কয়েকবার অস্ত্রোপচারও করা হয়েছে। না বলে দিলে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এটি এ গ্রহেরই প্রাণী। সবার চোখ তখন কপালে— যতখানি না বিড়ালটির পরিবর্তন দেখে তার চেয়ে বেশি ওর বেঁচে থাকা দেখে।

ভাবি অবাক হয়ে জানতে চাইল— দুই মাস না খাইয়ে রাখলি, ফ্রিজে রাখলি পাঁচ দিন তারপর আবার চুলোয় জ্বালালি ঘণ্টাখানেক— এতকিছুর পরও মরলো না? ঘটনা কীরে?

মরবে কী করে! এইটাই তো আমার আবিষ্কার।

সবাই তাজ্জব বনে গেলাম—এ কেমন পিলে চমকানো আবিষ্কার রে বাবা! চারদিকে উল্লাসকে নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। নামসহ বিড়ালটির ছবি ফলাও করে ছাপা হলো কাগজে—উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটিও এখন সেলিবেট্রি। ওর নতুন নাম উলাইকা! উল্লাস আর লাইকার সঙ্গে মিলিয়ে।

আমরা একদিন উল্লাসের ঘরে গিয়ে জানতে চাইলাম—গোপন রহস্যটা কী রে? বল, আমরা বাইরের কাউকে বলব না, কথা দিলাম।

উল্লাস একটু ভেবে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে— ধুর, মরবে কি করে, ও তো আগে থেকেই মরা। আমি একটু একটু করে মেরে নিয়েছি না! বিলুর মা মরেছে? মা, তুমি এত অত্যাচার করো। বিলুর বাপ প্রতিদিন পেটায়। চাচ্চু, মদ খেয়ে তুমি মাঝে মধ্যে যাচ্ছেতাই ভাবে...! সেদিন দেখলাম বাবা, তুমিও!

ভাবি ওর মুখ চেপে ধরল।

আমরা ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম চোরের মতো দ্রুত, নিঃশব্দে।

আমার আসল আবিষ্কারের কথা তো শুনে যাও?—চেঁচিয়ে বলল উল্লাস।

গল্প না বা নিছক কল্পনা

শকুর পেয়াদা এখন ট্রাক চালায়। জীবিকার জন্য অনেক কিছুই করেছে। প্রথম সে রোজগেরে হয় মায়ের গলার রুপার হারটা বিক্রি করে। অভাবের সংসারে মা অনেক কষ্টে শকুরের বউয়ের জন্য হারটি টিকিয়ে রেখেছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল— মায়ের যে ভুলো মন— হারটা মিয়াবাড়ির পুকুরের পেটেই গেছে। কিছুদিন পরেই শকুরের ছোটো চাচা বিয়ে করে ঘরে বউ আনলো। বউ তো নয় যেন জল টলটলে পুকুর, দেখলেই ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করে। শকুরের উঠতি বয়স— সবে সেয়ানা হতে শুরু করেছে। বিয়ের দিন সাতেক যেতে না যেতেই এক অমাবস্যার অন্ধকারে বউয়ের গলায় হাত মারলো সে। অন্ধকারে হাতটা গিয়ে কোথায় পড়ল কে জানে— বউয়ের সে কী চিৎকার, শকুরের পিলে চমকানোর অবস্থা! পিছন থেকে চাচা এসে দিলো কষে এক ঘা। তারপর বেদম চড়থাপ্পড়। 'ছিঃ! তুই শেষ পর্যন্ত আপন চাচিকে...! তোকে যেন এই গাঁয়ের ত্রিসীমানায় আর না দেখি!'

ওই রাতেই গাঁ ছেড়েছে শকুর। চোর বললে না হয় একটা কথা ছিল, যে অপবাদ জুটেছে তাতে চাচা না বললেও সে এ গাঁয়ে আর থাকত না।

কুষ্টিয়া শহরে এসে মজমপুরে একটা গাড়ির গ্যারেজে কাজ জুটিয়ে নিলো। কয়দিন পর গ্যারেজ থেকে উঠে পড়ল গাড়িতে— কিছুদিন হেলপারগিরি করল। একদিন গাড়ির সুপারভাইজারের পকেট থেকে কিছু টাকা হাতিয়ে নেমে পড়ল আরিচা ঘাটে, তারপর আর এদিকটায় ফেরেনি। মাছের ব্যবসা থেকে শুরু করে কাঁচামালের ব্যবসা, নাইট-ডিউটি, কুলিগিরি রিকশা চালানো— কী না করল তারপর!

এখন বয়স তার ৬৫ ছুইছুই। তবে যারা ইতোমধ্যে শকুরকে নিয়ে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, তাদের বলে নেওয়া ভালো—গল্পটি শকুরকে নিয়ে নয়। এই গল্পের প্রধান চরিত্র কল্পনা। কেউ বলে কল্পনা রায়, কেউ বলে কল্পনা খাতুন। আসল নামটা কী যেন ছিল, কল্পনা মনে করতে পারে না। থাকে যশোরের পতিতাপল্লিতে। সেই আট বছর বয়স থেকে এখানে আছে। এই পল্লিতে যারা আসে তাদের সবার একটা করে গল্প থাকে। কারো কারো গল্প খুব বেদনাদায়ক, শুনলেই শরীরের সবক'টি রোম দাঁড়িয়ে তিরতির করে কাঁপতে থাকে। কল্পনার গল্পটি তেমন নয়। খুব সাধারণ সাদামাটা একটা গল্প। তবু যেহেতু গল্পের প্রধান চরিত্র সে, তাই ওর গল্পটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে শোনাতে হচ্ছে।

কল্পনার মা ঢাকায় একটি গার্মেন্টসে কাজ করত। গাঁয়ের বাড়িতে ছিল একপাল মানুষ। বাবা অক্ষম, কাজ করতে পারত না, তার এই অক্ষমতা সে খানিকটা পুষিয়ে নিয়েছিল মধ্যরাতে মায়ের জমিনে ঘনঘন বীজ বপন করে। তাই পরিবারের জনসংখ্যা বেড়েছে বছরে বছরে, বেড়েছে খাবারের চাহিদা। এই চাহিদার সিংহভাগ কল্পনার মাকেই মেটাতে হতো। কাজ করে যা জুটত তা থেকে খেয়ে-কর্মে এক পয়সাও বাঁচত না। উপরি ব্যয় মেটাতে মাঝেমধ্যে তাকে ঢাকার সস্তা হোটেলগুলোতে নাইট ডিউটি করতে যেতে হতো। একবার এক নাইট ডিউটি চলাকালে তার সাথে পরিচয় হয় মোটাতাজা এক লোকের। লোকটি কল্পনার মায়ের প্রেমে পড়ে যায় প্রথম সাক্ষাতেই। তারা বিয়ে করে সংসার পাতে বস্তির ছোট্ট এক খুপরিতে। বছর পার হতে না হতেই জন্ম হয় কল্পনার। বেশ সুখের সংসার ছিল তাদের। কল্পনার বাবার বদ অভ্যাস বলতে— মাঝেমধ্যে নেশাটা একটু ধরলে কল্পনার মাকে হালকা মারধর করা। নেশা ছাড়া সে আর পাঁচটা মানুষের মতোই খুব সাধারণ।

কল্পনার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়, বস্তিতে ওরা যে ঘরে থাকে তার পাশের ঘরটিতে কমবয়সী একটা মেয়ে এলো। কল্পনার মায়ের মতোই গাঁ থেকে এসেছে। এক মাসের মাথায় মেয়েটি উধাও, সঙ্গে কল্পনার বাবাও। বাবা হারানোর বছর পুরতে না পুরতে মাও গেল। সন্ধ্যায় ঘরের মালিক নজু চাচা তার লাল মরচেপড়া দাঁত বের করে বলল— 'তুই কাল থেকি আমার সাথে থাকবি। আমি নয়া ভাড়াটি তুলবু। তোর মা আর আসবি না। হেই আজ সকালে গার্মেন্টসে আগুন লেগি পুড়ি মরিচে।' প্রথম

থেকেই নজু চাচার সাথে কল্পনার খুব ভাব ছিল। তাই হয়তো সে কল্পনাকে ফেলতে পারেনি। নজু চাচা খুব আদর করত কল্পনাকে। প্রায়ই কল্পনাকে বুকের উপর তুলে জালি উরুতে হাত বুলাতে বুলাতে ঘুম পাড়াতো তাকে। একদিন নজু চাচা বলল, 'চল, তোরে আমি আমার বুনের কাছে র‍্যাইখা আসি। দেখবি, মেলা মজা ল্যাগবি।'

প্রথমদিকে কল্পনা ভেবেছিল এটা এতিমখানা। তবে তার বয়সি হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া আর সবাই বয়সে বড়ো, সব মেয়েমানুষ। তাই এতিমখানা না হলেও এটা যে আশ্রম জাতীয় কিছু একটা সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত ছিল। এখানে এসে তার খারাপ লাগত না মোটেও। লাগবেই বা কেন? পেট পুরে খেতে পেত, স্নো-পাউডার মাখতো। বিন্দু খালা ওকে জোর করে খাওয়াত। না খেতে চাইলে খিস্তি দিয়ে বলত— 'নে খা, খেয়ি তাজা হ তাড়াতাড়ি। গতরে মাংস না লাগলি কি মাগি মানষের দাম আছে দুনিয়াই!' কল্পনাও বিন্দু খালা বলতে পাগল। শিশুরা পশুর মতো, ভালোবাসা আর মন্দবাসা ছাড়া কিছুই বোঝে না।

কল্পনার সেই দিনগুলোর কথা আবছা আবছা মনে আছে। সে পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পায়— ভীষণ কুয়াশা, কিছুই ঠাওর করা যায় না। একভাবে তাকিয়ে থাকলে একসময় কুয়াশা কিঞ্চিৎ সরিয়ে একটা চাটাইয়ের ঘর দেখা যায়, কারা যেন ফিসফাস করে ভেতরে। থেকে থেকে একটা ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না আসে। খানিকটা এগিয়ে গেলে ঘরের ভেতরকার মানুষগুলোকে অস্পষ্ট দেখা যায়। এটুকু অবলম্বন করেই কল্পনা বেঁচে থাকে।

সময়ের সাথে সাথে বিন্দু খালার যত্ন-আত্তির মাত্রাও বেড়ে যায়। না খাওয়া শরীর একটু আদর যত্ন পেয়ে যেন-বর্ষার নদীর মতো ফুলে ফেঁপে ওঠে।

একদিন পূর্ণিমার রাতে, কল্পনার বয়স তখন বারো কী তেরো হবে— কল্পনা সেদিন সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিল— স্বপ্ন দেখল— ভয়ংকর একটি স্বপ্ন। একটা মানুষের মতো জন্তু কিংবা জন্তুর মতো মানুষ একটি ধারালো তপ্ত চাকু দিয়ে কল্পনার শরীরের কোথায় কোথায় যেন ছেদ করে দিতে চাচ্ছে! ও ভীষণ চিৎকার করছে কিন্তু কেউ কিছুতেই শুনছে না, স্বপ্ন তো! সকালে ঘুম ভেঙে দেখল তার পাজামা রক্তে ভিজে জবুথবু অবস্থা। কী সর্বনেশে স্বপ্ন! কল্পনা দিন পনেরো বিছানায় পড়ে থাকল। ক'দিন পর

ফের দেখল সেই স্বপ্নটি। তারপর থেকে মাঝে মধ্যে দেখত, রক্তে ভিজে যেত না পাজামা। এরপর স্বপ্নটি সয়ে যায়।

কল্পনার বয়স এখন ত্রিশ ছুঁলো বলে। বেশ্যাবাজারে কাঁচা শরীর বিকোয় বেশি। এ কয় বছরে— রাত নেই দিন নেই— কত ধকল গেছে শরীরটার উপর দিয়ে! কল্পনার মাঝেমধ্যে মনে হয়, বাংলাদেশের প্রায় সকল পুরুষই তার দেহটা নগ্ন করে মগ্ন হয়ে দেখেছে, মাতাল হয়ে মাতলামি করেছে ভিতরে ও বাইরে। এখন তার বিশ্রাম দরকার। কিন্তু শরীরটার জন্য পারে না। ওর শরীরের গাঁথুনিটা বেশ মজবুত, সেগুনগাছের মতন পিটানো। বেশ্যাপল্লিতে বরাবরই সবাই হিংসা করেছে তাকে। আর ওদেরকে হিংসা করেছে কল্পনা— গতরটা এত দেখনা না হলে এত ধকল যে তাকে সহ্য করতে হতো না! কোনো কোনো রাত এমন গেছে— এক সাথে পাঁচজন খরিদ্দার এসেছে, পাঁচজনই চায় কল্পনাকে। কল্পনা লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে একে একে সকলের খায়েশ মিটিয়েছে। এখন আবার ভারত থেকে একটা বড়ি এসেছে— গরু মোটাতাজাকরণ বড়ি। বিন্দু খালা কল্পনাকে নিয়ম করে কয়েক ডোজ খাইয়েছে। এ বয়সে গা-গতরে একটু মাংস লাগলে এ বাজারে বিকোয় বেশি। কল্পনার বাজারদর আবারও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এই পল্লিতে যে একবার এসেছে অথচ কল্পনার নাম জেনে যায়নি এমনটি ঘটেনি। দেখে শুধু আফসোসই হয়েছে অনেকের, আগে থেকে বুকিং না দিলে যে কল্পনা কপালে জোটে না! তারপর আবার তিনটা দেহের দাম সে একাই হাঁকায়। এসব দামদর খালাই করে, কল্পনার আয়ের একটা বড় হিস্সা নাকি এমপি, মন্ত্রী পর্যন্ত চলে যায়!

এ সপ্তাহে কল্পনাকে বুকিং দিয়েছে শকুর পেয়াদা। শকুর দিন পনেরো যশোরেই থাকবে। এখন ফুলের মৌসুম যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রাকে করে গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা পৌছে দেয় শকুর। আজ রাতে প্রথম গেল কল্পনার কাছে। ও তখন ড্রেসিং টেবিলে সাজগোজ করছিল। বিন্দু খালা শকুরকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে বলে গেল— 'মেহমান বাইরির, খাতির যেনে কম না হয়!'

কল্পনা আয়নাতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো শকুর পেয়াদাকে। কল্পনা আর নড়েও না, চড়েও না। শকুর কণ্ঠস্বরটা একটু পিচ্ছিল করে বলল— 'কই, এদিকে একটু আয় দিকিনে। তোর নাকি একিনে হেবি ডিমান।'

শকুর উঠে গিয়ে কল্পনার কাঁধে হাত রাখলে কল্পনা এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে— 'সাহেব, আজ আমার শরীলডা ভালা না। পায়ে পড়ি, আপ্নে অন্য কুতাও যান। ফুল আছে পাশকার ঘরে, মেলা সুন্দরী, বয়সেও কাঁচা, উকে ডেকি দিই?'

শকুরের মায়া হয় কল্পনার ওপর। 'ঠিক আছে, আমি জুলুম করবু না। কাউকি ডাকতি হবি না। এদিকে একটু আয়, আমার পাশে বস, তোর লগে একটু কথা কই। মেলা দিন কারু সাথে গল্প করিনি।' শকুর অনেকটা জোর করে কল্পনাকে কাছে টেনে বসাল। কল্পনার বাঁ-বুকে হাত দেওয়া মাত্রই কল্পনা এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একদিন পর আবার আসে শকুর। কল্পনা গো ধরে আয়নার সামনে বসে থাকে। শকুরের শেষ বউটার কথা মনে পড়ে যায়। একটু ফিরতি রাত হলিই মাগির সেকি দিমাগ! তারপর ছেলি ভুলানোর মতো করি এটাসেটা দেয়ার কথা বুলি মাগির দেমাগ ভাঙাতি হবে। কল্পনা কী চায় তার কাছে? টাকা?

'কাছে আয়। কিছু টাকা ধরে দিবুনি। আমার কে আছে খাবার! একুন থেকি তুই খাবি। পায়ের ওপর পা তুলি আরাম করি খাবি।'

'কেনে, আপনার বউ ছেলেপুলে নেই?'

'ছেলো, সব ছেলো। একুন নেই। এক মাগির ঢেসাই পড়ি সব শেষ হয়ি গিছে।'

'তা'লি আবার মাগির কাছে আইছেন যে?'

'মাগি ছাড়া গতি আছে নাকি পুরুষ মানুষের? মাগি না খ্যালি, দুনিয়ার এত ধন-ট্যাকা খাবে কেডা? আর তুই মাগি হতি যাবি কেনে? তুই হচ্ছিস কি যে আমার তুলতুলে টিয়া পাখি। কাছে আয়, তোকে আমি টিয়ার সাজ এনি দেবো একদিন।'

শকুর ভোলানোর চেষ্টা করে। কিছুতেই কিছু হয় না। ওর কেন জানি ভালো লেগে গেছে মেয়েটিকে, জবরদস্তি করতে মন চায় না। আজও ভালো মানুষের মতো উঠে গেল। এইভাবে সে জীবনে কোনো মাগির ঘর থেকে উঠে আসেনি। আজ যাওয়ার সময় বিন্দু খালাকে বলে গেল বিষয়টি।

'কাল একটু আইসেন তো। আমি দেখছি খানকির কিসির এত ছেনালি! দরজা বন্ধ করি চুলের মুঠি ধরি শায়েস্তা করবেন। বাগে না

আসলিই তো খেলা জমে ভালো।' বিন্দু খালা পান চিবোতে চিবোতে নোংরা দাঁতগুলো বের করে বলল কথাগুলো।

পরদিন মধ্যরাতে হাজির শকুর পেয়াদা। আজ সে মাতাল হয়ে এসেছে। চোখের ভেতরটা পাকা তরমুজের মতো লাল টকটক করছে। শকুরকে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজার ছিটকানি তুলে দেয় বিন্দু খালা। কল্পনা ছুটে যায় দরজার কাছে— 'ও খালা, তোর পায়ে পড়ি, দরজাটা খুলে দে। আমি হের সাথে শুতি পারবু না যে! ও খালা, আমার এত বড়ো সর্বনাশ তুই করিসনে।' আজ আর শকুর কোনো কথা বলে না। কোনো কথা শুনতেও চায় না। পেছন থেকে চুলের মুঠি চেপে ধরে। লুঙ্গির গিঁট্টু খুলেই লাফিয়ে পড়ে কল্পনার ওপর। কল্পনা কী যেন বলতে চায়, শকুর কল্পনার মুখ চেপে ধরে এক হাতে, অন্য হাতে কল্পনাকে নগ্ন করে। কল্পনার আর কিছুই বলার নেই। মরা সাপের মতো দেহ এলিয়ে পড়ে থাকে সে, শকুর পেয়াদা উপরে ডাঙায় তোলা টাকি মাছের মতন ছটফট করে। জন্মের সুখ সে মিটিয়ে নেয় কল্পনার দেহে।

কল্পনা বিড়বিড় করে বলে— বাপজান, সেই যে গেলি আমাকে টিয়া পাখির সাজ এনি দিবি বুলি! আর তো অ্যালি না?

যেভাবে লেখা হলো বাবু মণ্ডলের জীবনবৃত্তান্ত

'চলে গেলেন কবি বাবু মণ্ডল। তিনি এই সময়ের আলোচিত লেখক ছিলেন। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে দেশের নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর কথা। তিনি ছিলেন জনদরদি কবি। মানুষই তাঁর লেখার মূল উপজীব্য ও প্রেরণা। নিভৃতচারী এ কবির মৃত্যুশোকে দেশের সাহিত্যমহল শোকে নিমজ্জিত...'— কথাগুলো একটি দৈনিকে পড়েছিলাম। কিছু দিন আগের ঘটনা। বাবু মণ্ডলের কোনো লেখাই আমার পড়া হয়ে ওঠেনি। ভালো কবি হলেও দেশের মেইনস্ট্রিম সাহিত্যে ততটা পরিচিত ছিলেন না। মৃত্যুর পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে কীভাবে যেন তাঁকে নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। রাজধানীর প্রকাশকরা এখন তার বই প্রকাশের জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাদের ধারণা হয়তো এই আলোচনার সূত্র ধরে কিছুটা ব্যবসা হতে পারে। যে-সকল লেখক তাঁর লেখায় ভুল-ত্রুটি উদ্ধার করে সমালোচনা করতেন বলে শুনেছি তাঁরাও এখন স্তুতিবাক্য লিখছেন। এক সময় পত্রিকার প্রুফরিডারের কাজ করার দরুন ওইসব সমালোচনার কিছু কিছু আমাকে পড়তে হয়েছে। দু-একটি সাহিত্যের বই যে আমি জীবনে পড়িনি তা নয়। কিন্তু বাবু মণ্ডলের কবিতা পড়ার সুযোগ ও সময় কোনোটাই হয়ে ওঠেনি। যে পত্রিকা তাঁর একটা লেখাও ছাপেনি কোনোদিন, সেই পত্রিকা এখন তাঁর জীবন নিয়ে ফিচার করবে। দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।

সময় দেওয়া হয়েছে তিন দিন। খবর গরম থাকতে পরিবেশন না করলে কাটবে না। এ অল্প সময়ে বাবু মণ্ডলের কোনো বই আমার পক্ষে পড়ে ফেলা সম্ভব নয়, তাই প্রকাশিত যে কয়েকটি বই আছে সেগুলোর

নাম মুখস্থ করে রওনা হলাম নিচিনপুরের দিকে। নিচিনপুরেই কেটেছে বাবু মণ্ডলের জীবনের বাল্য ও যৌবন। বাকিটা সময় তিনি সপুরাহাট গঞ্জে কাটিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে গেলেন হাসু ভাই। হাসু ভাই আগে একটি অ্যাড এজেন্সিতে কাজ করতেন, সুবিধা না করতে পেরে আমাদের পত্রিকা অফিসে জয়েন করেছেন। তাকে সঙ্গে নেওয়ার কারণ তিনি বাবু মণ্ডলের অঞ্চলেরই মানুষ, একবার বাবু মণ্ডলের একটা কবিতাও নাকি পড়েছিলেন। কবিতার প্রথম লাইনের একটা শব্দ তার এখনও মনে আছে, শব্দটি হলো 'পিরিত'। গাড়িতে গর্বের সঙ্গে বেশ কয়েকবার জানালেন সে কথা। এ নিয়ে তিনি ছোটোখাটো একটা গবেষণাও করে ফেললেন। তার ধারণা, কবিতাটি যদি কবি প্রথম জীবনে লিখে থাকেন তাহলে তিনি কোনো তরুণীকে মাথায় রেখেই লিখেছেন। এবং মেয়েটি সম্ভবত খুব একটা শিক্ষিত ছিল না, এ জন্যই 'প্রেম' শব্দটা ব্যবহার না করে তিনি 'পিরিত' শব্দের ব্যবহার করেছেন। আর যদি জীবনের শেষের দিককার লেখা হয় তাহলে এ 'পিরিত' বলতে তিনি জগতের প্রতি মায়াকে বুঝিয়েছেন। কারণ বৃদ্ধবয়সে সবাই পৃথিবীর প্রেমে পড়ে।

ইম্পেপ্রসিভ! ভেরি ইম্পেপ্রসিভ! আপাতত তাও কবি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল।

আমরা বিকেল ৪টায় নিচিনপুরে পৌছলাম। গ্রাম বলতে যা ধারণা করে এসেছিলাম, নিচিনপুর ঠিক তার উল্টো। মিনি শহর বললে ভুল বলা হবে না। গ্রামে ঢুকেই বেশ বড়সড় একটা মোড়। এখানে খাওয়ার হোটেল, ডিসপেনসারি থেকে শুরু করে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকানপাট আছে। অনেক মানুষের জটলা সেখানে। হাসু ভাই বললেন কাজটা এখান থেকেই সেরে ফেলতে। আমাকে যেটা করতে হবে তা হলো, বাবু মণ্ডলের কাছের কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত লিখে নিয়ে যেতে হবে।

হাসু ভাইয়ের কাছে একটা রেকর্ডার ছিল। হোটেলে চা-শিঙ্গাড়া খেতে খেতে উঠল কবি বাবু মণ্ডলের কথা। হোটেলের মালিক হেতেম মিয়া কবি সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। যথাসম্ভব এডিট না করে তার মুখের কথা আমি এখানে উঠিয়ে দিচ্ছি :

'হেই খুব ভালো লোক ছেল। মানষের মুখে তার কথা অনেক শুনচি। ওরা নাকি সেই গরিব ছেল! আমাদের তো কবকার দুকান, তেকুন দুকানে

আমার দাদার সাথে বাপও বসতুক। বাপের থেকি বয়সে বাবু মণ্ডল বছর পাঁচেকের ছোট ছেল। বাপরা সবাই তাকে হাবু বুলি ডাকতুক। বুদ্ধি-শুদ্ধি নাকি কিছুই ছেল না। আমাদের হটিলের ছুমুতে খালি বসি থাকতুক। আমার বাপের ছোট-খাটোও হুকুম-হাকামও শুনতুক। একবার নাকি তার আমাদের হটিল কাজ করার খুব খায়েস হয়লো। আসলে এই এলাকায় আমাদের হটিল ব্যবসার খুব নাম-ডাক আছে। শুনচি শেষ বয়সে লোকটা না খেতি পেয়ি মরি গিছে। কী সব কবিতা-টবিতা লিকতুক। মানষের ভিমরুতি ধরছি যা হয়! সারাজীবন ধরি কি সব লিখলু, একটাও কাজে দিলু না। বিনা চিকিৎসায় মরলু। হের বইয়ির কাগজ দি আমার হটিলের মানষে একুন হাত মোচে।...'

সে বকেই চলে একটানা। হাসু ভাই বিরক্ত হয়ে রেকর্ডারটা অফ করে ফেলে।

ওইদিন ওখানেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার মান্নান সাহেবের বাড়িতে। হাসু ভাই আগেই ব্যবস্থা করেছিল সব। রাতে মান্নান স্যারের বাড়িতে বেশ ভালোই খাওয়া-দাওয়া হলো। মান্নান স্যার আমার বাবার বয়সি—আমার বাবার বয়স কত আর, এই ৫৫ বছর হবে, মানে জীবিত থাকলে সেটাই হতো! খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কবি বাবু মণ্ডলের প্রসঙ্গে আমরা কথা বলা শুরু করলাম। হাসু ভাই ঘুমাতে গেল। শরীরটার মতো ঘুমও তার বেজায় ভারী। এ দুটোকে সামলাতে তাকে বেশ হিমশিম খেতে হয়। এ নিয়ে আমাদের অফিসে মজাও কম হয় না। অফিসে কাজের সময়ে কেউ হাসু ভাইকে কিছু জিজ্ঞেস করলে শুরুই করেন এই বলে—হাসু কি জেগে আছ? সে অন্য প্রসঙ্গ। আমরা প্রখ্যাত কবি বাবু মণ্ডল সম্পর্কে কথা বলছিলাম। মান্নান স্যার পান মুখে গুঁজে বলা শুরু করলেন। ভঙ্গিমাটা এমন যেন তিনি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। রেকর্ডারটা হাতে শক্ত করে ধরেছিলেন। 'বাবু মণ্ডল বড় ঘরের ছেলে ছিল। মণ্ডল বাড়ির একমাত্র ছেলে ছিল বাবু মণ্ডলের দাদা হাফেজ মণ্ডল। কিন্তু লোকটা সংসারী ছিলেন না মোটেও, শুনেছি তিনি নাকি আমার দাদার পেছনে ঘুরঘুর করতেন। আমার দাদা এডুকেট মানুষ ছিলেন। দশগাঁয়ে তার মতো এডুকেট মানুষ দুটো ছিল না। ইংরেজরাও নাকি দাদার ইংরেজি শুনে টাসকি খেয়ে যেত! দাদার কাছ থেকে বাবাও ভালো ইংরেজি

শিখেছেন। আর আমি বাবার কাছ থেকে শিখেছি খানিকটা। (আমি বাবু মণ্ডলের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিলে)। ও হ্যাঁ, বাবু মণ্ডলের দাদা জুয়া খেলে, এ-দেশ সে-দেশ জানি করে সব সম্পত্তি শেষ করে ফেলল। একেবারে যে কিছু ছিল না তাদের তা নয়। বাবু মণ্ডল যদি শক্ত করে ফ্যামিলির হালটা ধরত তাহলে ভালোই চলত তার। বাবু মণ্ডল আমার থেকে বছর তিনেকের সিনিয়র ছিল। স্কুলে দেখতাম, পড়াশোনা না করে গাছপালা-মেয়েমানুষ মিশিয়ে কী সব লিখছে! আমি ক্লাস টু-এর ছাত্র হয়ে যা জানতাম ও ক্লাস ফাইভের ছাত্র হয়েও তা জানত না। পরে আমি যখন ক্লাস ফাইভে উঠলাম, ততদিনে সে লেখাপড়াই ছেড়ে দিল। ভাতের জন্য কিছু না করলে কি আর ফ্যামিলি টেকে? টেকেওনি। (তার কোনো কবিতা পড়েছেন কিনা জানতে চাইলে, একটু বিরক্ত হয়ে।) আমার বাপু অত টাইম কোথায়? স্কুলের হেডমাস্টারি করা চারটেখানিক কথা? কত ঝামেলা-ঝক্কি পোহাতে হয়। তোমরা পোলাপান, তোমরা ওইসব পড়বা। আর তাছাড়া আমি ইংরেজির ছাত্র। তবে শুনেছি ভালো লিখত। একবার আমাদের স্কুলে যিনি বাংলা পড়ান, বলতে শুনেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের মতো লাইন-ঘাট থাকলে নাকি নোবেল জিতা বাবু মণ্ডলের ওয়ান-টুর ব্যাপার! সে যে লেখাপড়া না জেনে শুদ্ধ করে লিখতে পারত এই তো বিরাট ব্যাপার।'

মান্নান স্যার আরও অনেক কথা বলেছিলেন। কিন্তু কখন যে রেকর্ডারের চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছিল টের পাইনি। তাই তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

রাতে ঘুমটা বেশ ভালো মতোই হলো। পরদিন সকালে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শেষবারের মতো আমরা আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললাম। তাদের মধ্যে হুজুর গোছের এক ব্যক্তি কবি বাবু মণ্ডলের বিরুদ্ধে অনৈসলামিক কথাবার্তা বলার অভিযোগ তুললেন। তিনি বললেন :

'লোকটা সারাজীবন কী সব অকাম-কুকাম লিখচে। শেষ বয়সেও ভীমরতি ধরছিল। গঞ্জে কাকে নাকি মেয়ি পাতি তার বাড়িতে থাকতুক। নাউজুবিল্লাহ! লোকটাকে আমি একদিনও মজ্জিদে দেখিনি। আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে না, কাল কেয়ামতে তার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি। এই সব পাঁজি লোককে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা উচিত।'

এরপর শিক্ষিত আধা বয়স্ক সোবহান নামের এক ব্যক্তি বললেন :

'খুবই চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। তাঁর চিন্তা মোতাবেক আমরা যদি সমাজটাকে সাজাতে পারতাম তাহলে কি আর এত অশান্তি হয়! তিনি মানুষ নিয়ে ভাবতেন, সমাজ নিয়ে ভাবতেন। তাঁর লেখা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু তাঁর সাথে একবার কথা বলার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।'

এক কলেজপড়ুয়া মেয়েকে কবি বাবু মণ্ডল সম্পর্কে জানতে চাইলে বলল :

'বাবু মণ্ডল? কে সে? আপনে কি আমাদের কলেজের পিয়ন বাবু ভাইয়ের কথা বলছেন?'

আমাদের ঢাকা ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। আসার পথে বাবু মণ্ডলের কবরটা রাস্তার বাঁ দিকে পড়েছিল। হাসু ভাই ঘুমাচ্ছিল বলে আর নামা হয়নি। তাছাড়া ঢাকায় ফিরেই কাজটা রেডি করতে হবে, এত সময় আমাদের হাতে কই?

মসজিদ

জুমার আজানের পর ইমাম সাহেব আজ নিজে মাইকে দাঁড়িয়ে সকলকে মসজিদে আসার জন্য বলেছেন। গ্রামের সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য ইমাম যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি এভাবে সকলকে সমবেত হওয়ার জন্য বলেন। ইমামের কথা ফেলবার সাধ্য কারও নেই। তাই আজ যারা নামাজ পড়ে না তারাও গেল। যাদের এখন ক্ষেতে পানি দেয়ার কথা ছিল তারাও গেল। যার একটি পা নেই, নাতি ছেলের কাঁধে ভর করে সেও গেল। আল্লাহর সাথে যার ভেতরে ভেতরে গভীর দ্বন্দ্ব, সেও গেল। গ্রামে যে কয়েকঘর হিন্দু-ডোমদের বাস ছিল, তারাও গেল—মসজিদের গেটে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়, আজ যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার সাথে এদের স্বার্থও জড়িত।

ইমাম সাহেব শুরু করলেন: 'মুমিন, ইমানদার ভাইয়েরা আমার! আপনারা ইতিমদ্যি টের পেয়িছেন, আল্লাহ আমাদের ওপর চরমভাবে নাখোশ। তাঁর অভিশাপ নাযিল হয়িছে এই রহমতগঞ্জের ওপর। মাঠে দাও দাও করি আগুন জ্বলছি। সোনার ফসল পুড়ি ছাঁই হয়ি যাচ্ছি। আল্লাহর আদেশে সূর্য তার শক্তির কেরামতি দেখাচ্ছি। সবাই না খেয়ি মরবি—আল্লাহর সাথে নাফোরমানি! দিলে আল্লাহর ভয়-ডোর আনো মিয়ারা, তোমাদের জন্যি আরো কঠিন দিন অপেক্ষা করছি। কথায় আছে, 'উন বর্ষায় দুনো শীত!' এইবার খরায় সব পুড়ি যাচ্ছি, পরের বার দেখবা বানের পানিতে বও-বাচ্চা সব ভেসি যাচ্ছি। তাই এখুনো সময় আছে, তুমাদের বাল-বাচ্চাদের বাচানুর।'

'হুজুর, আমরা গ্রামের ব্যাবাক মানুষই তো নামাজ পড়ি, তাহলি ক্যানে এই গজব?'—জানতে চাইলেন মুরুব্বি গোছের এক কৃষক।

'শুধু নামাজ পড়লি হবে মিয়া? এই মসজিদের দিকে একবার নজর দি' দেখ,—গেল পাঁচ বছর ধরি শুধু মেঝেটাতেই ইট পড়িছে। আল্লাহর ঘরকে এত অবহেলা করলি গজব নাজিল হবি না তো এমনি!'

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া গ্রামের একমাত্র ছেলেটি দাঁড়িয়ে গেল, 'হুজুর, বেয়াদবি নেবেন না, মসজিদ পাকা হওয়া না হওয়ার সাথে খরার কী সম্পর্ক বুঝলাম না! দেশে তো আর পাকা মসজিদের অভাব নেই! খরা তো এখন দেশ জুড়েই। তাছাড়া, আমাদের গ্রামের সকলেই চাষি, পুরো গাঁয়ে চেয়ারম্যান সাহেব আর আপনার ঘর ছাড়া পাকা কোনো ঘর নেই। এই গাঁয়ের মসজিদ কাঁচা হলি ক্ষতি কী?'

হুজুর তেলে-বেগুনে তেঁতে উঠলেন—'কি! আল্লাহর ঘরে বসি আল্লাহর সাথে নাফোরমানি? এই পোলাকে আজই গাঁ ছাড়া করতি হবে। মাদ্রাসায় শিক্ষা নিলি আজ ওর এই গতি হতুক না।'

খ.

কয়েকদিনের মধ্যে ইমামের নির্দেশ মোতাবেক মসজিদ পাকা করার কাজ শুরু করা হলো। গ্রামের সকলে তাদের সাধ্যমতো দান করল। যার সাধ্য নেই সেও কিছু দিলো। আম্বিয়ার বাপ এই দুর্ভিক্ষের মৌসুমে যে অল্প কটি ফসল ঘরে তোলেছিল তার সবটাই প্রায় ইমামের হাতে তুলে দিল। পশ্চিমপাড়ার শকুর তার একমাত্র হালের গরুটা আল্লাহর ঘর তৈরিতে সঁপে দিল। নারীরাও থেমে থাকেনি—কেউবা হাতের বালা, কেউবা কানের দুল, কেউবা গলার মালা। শিশুরা বাঁশের ফোঁকরে কিংবা মাটির ব্যাংকে আসছে মেলা থেকে রঙিন খেলনা কিনবে ভেবে যে দু' চারআনা পয়সা জমা করেছিল তাও দিয়ে দিলো। গ্রামে খরা কিংবা বন্যায় শহরের মানুষদের সহযোগিতা না পেলেও মসজিদের জন্য তারা দু'হাত ভরে দিলো।

মসজিদের দেয়াল তোলা হলো। ছাদ করা হলো। রঙ করা হলো দেয়ালে। পাশের গ্রাম থেকে বিদ্যুৎ আনা হলো। মাইক লাগানো হলো চতুর্দিক তাক করে। গুনে গুনে দশটি বৈদ্যুতিক বাতি ও ফ্যান সেট করা হলো। আরব দেশ থেকে ইমাম আর চেয়ারম্যানের জন্য কাবাঘর আঁকা তোলার জায়নামাজ উপহার দিলো পাশের গ্রামের সৌদি প্রবাসীর বাবা।

চেয়ারম্যান আর ইমাম সাহেব মসজিদের জন্য বিদেশ থেকে সাহায্য আনানোর ব্যবস্থা করছেন বলে জানালেন। তাদের ঘরেও রঙ করা হলো একেবারে বিলেতি ধাঁচে।

'বারবার মিস্ত্রি-টিস্ত্রি আনা ঝামেলা, তা কী বলো ইমাম?'

'আমিও যা ভাবছিলাম'—উত্তরে ইমাম সাহেব বলেছিলেন।

বেশ কদিন ধরে বিনামজুরে কাজ করল গ্রামের মানুষ। মসজিদ শেষ হতে না হতেই মহামারি দেখা দিল গ্রামজুড়ে। প্রকট মহামারি।

গ.

মজিদ তার ছয় বছরের ছেলে আর নয় বছরের মেয়েকে সকাল সকাল গোসল করিয়ে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরায়। মসজিদ দেখতে যাওয়া ওদের অনেক দিনের বায়না। আশপাশের গ্রামজুড়ে এখন মসজিদটা দর্শনীয় স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ বেশ ঘটা করে মসজিদে আসছে, ঘুরেফিরে দেখছে চারপাশ। ময়না আর মজনু, মজিদ মিয়ার ছেলে-মেয়ে, আজ বেজায় খুশি। মজিদ মিয়া তার একহাতে মেয়েকে অন্যহাতে ছেলেকে ধরে বেশ আনন্দে পা বাড়ায় মসজিদের দিকে। মসজিদের গেটে এসে মজনু বাবার হাত গলিয়ে ছুটে যায় মসজিদের ভেতরে। 'অ্যারে অ্যারে একী করলি, পা খান ধুয়ে যা আর একবার!'—মজিদ চেঁচিয়ে বলে। ময়না খুব যত্ন করে হাত-পা ধুয়ে মসজিদে প্রবেশ করে। মজিদ মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করার আগে বেশ দ্বিধায় পড়ে যায়—এমন ফাটা পায়ে উঠলে আল্লাহর ঘরের চকচকে মেঝেতে যদি দাগ পড়ে যায়! মজিদ মসজিদের এক কোনোয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। 'এটা আমাগো মসজিদ, তাই না বাপজান?'—ময়নার যেন বিশ্বাসই হয় না। মজনু আর ময়না যে যার মতো করে মসজিদের ভেতর ঘুরেঘুরে দেখতে থাকে। ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে তাকিয়ে মজনু অবাক হয়। 'আব্বা, এইটা কেমনে ঘোরে?' 'সবই আল্লাহর কুদরত বাপ।'—উত্তর দেয় মজিদ। 'ফেরেশতারা ঘুরায়, তাই না বাপজান?'—ও পাশ থেকে বলে ময়না।

মজনুকে ভেতরে দেখে তেড়ে আসে ইমাম— 'এই, কার ছোকরা এটা, হ্যাফপান্ট পরি ঢুকি পড়িছে? বের হ বলছি।'

ইমামের কথা শুনে ছুটে যায় মজিদ—'হুজুর, মাফ করবেন, এইডা আমার পুলা। কয়দিন থেকি মসজিদটা দেখতি চাচ্ছিল।'

'দেখতি চাচ্ছিল ভালো কথা। বাইরি থেকি দেখাবি। এইভাবে হ্যাফপ্যান্ট পরি কেও আল্লাহর ঘরে ঢোকে নাকি রে বেকুব! আর তোর পেছনে ওই মহিলাডা কে?'

'আমার মেয়ি হুজুর।' ভয়ে ভয়ে বলে মজিদ।

'জানিসনি মেয়ি মানষের বেপর্দা হয়ি মসজিদে আসতি নেই?'

'হুজুর, হেয় আমার দুধের বাচ্চা।'

'দুধের বাচ্চা, বুলিস কী! দেকিই তো মনে হয় বিয়ের বয়স পার হয়ি যাচ্ছি।'

'না হুজুর, গেল মাঘে ওর বয়স আট হয়িছে।'

'এখনই তো বিয়ের উপযুক্ত সময়। নবি কারিম (স.) আয়েশা (রা.)-কে যখন বি করে তখন তাঁর বয়স ছয় বছর ছেল। শোন, তোর মেয়ি মাশআল্লাহ সুন্দর আছে। বি' নি তোকে ভাবতি হবে না। বিহানে একবার মক্তবে আসিস।'

মজিদের মনটা কেমন জানি বিষিয়ে ওঠে। একহাতে মেয়ে অন্যহাতে ছেলেকে নিয়ে মজিদ মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে। মসজিদে আসাটা কাল হলো নাকি—ও মনে মনে ভাবে।

'আব্বা, আমাগো ঐ রকম বাড়ি হইব না? কী সুন্দর দেখতি! মনে হয় খালি দেখি আর দেখি!'

'ঐ রকম ঘর করতি মেলা ট্যাকা লাগে, তাই না বাপজান? অত ট্যাকা বাপজান কুতায় পাবে!'

'তালি তো আল্লার মেলা ট্যাকা, তাইনা বু?'

'মেলা ট্যাকা মানে! আল্লাহর কাছে বড় বড় ট্যাকার গাছ আছে, তাই না বাপজান?'

'হি! হি! হি!,' খিল খিল করে হেসে ওঠে ময়না, 'তোর মাথায় ঘেলু নেই। আল্লাহ দুনিয়ায় থাকে নাকি! আল্লাহর ঘর হচ্ছি আকাশের মেলা ওপরে!'

'তালি ঐ মসজিদে কিডা থাকে? হুজুর স্যার যে বুললু, ঐডা আল্লার ঘর?'

'তোকে আমি বুঝাতি পারবু না। বাপজান, উকে বুঝাও তো?'

'এই থামবি তুরা? আল্লাকে যা মনে আসছি বুলি যাচ্ছিস! এসব কথা বুললি পাপ লাগবি।'

ঘ.

পরের বছর বর্ষা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে রহমতগঞ্জের ওপরে। গাঙের পানিতে ভেসে যায় মাঠ। নদীর বাধ ভেঙে রাতারাতি ডুবে যায় রহমতগঞ্জের অর্ধেকেরও বেশি বাড়িঘর। ভেসে যায় গবাদিপশুর সাথে মানুষও। মজিদের মাটির দেয়াল চাপা পড়ে মারা গেছে মজনু। ঘরবাড়ি হারিয়ে অনেক মানুষ এখন মসজিদের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে। মহিলা ও শিশুদের জন্য চেয়ারম্যান সাহেবের বৈঠকখানা ও পরিত্যক্ত গোয়ালঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে আশপাশের গ্রামে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে।

'আল্লাহর কী কুদরত, এত দুর্যোগেও মসজিদটার কিছু হয়নি!' ইমামের নিজের আর চেয়ারম্যানের বাড়িরও কিছু হয়নি, সেইটা তিনি বলেন না। 'এই মসজিদখান না থাকলি তুমরা কুতায় গি' দাঁড়াতিক? গ্রামের অর্ধেকেরও বেশি বাড়িঘর পানিতে ভেসি গেল অথচ এই মসজিদের একটা ইটও ডুবলু না। সবাই আল্লার কাছে শুকরিয়া আদায় কর।'— হুজুর জুমার খুতবায় বেশ কয়েকবার বললেন কথাটা।

'হুজুর, গেল বছর খরা গেল, এ বছর বানে ভেসি গেল গাঁ— আমরা এ কুন পাপের শাস্তি ভোগ করছি?'— বৃদ্ধলোকটা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

"শাস্তির কথা কেনে বুলছেন? বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। আল্লাহ পাক-কালামে বলছেন, তিনি যাদেরকে যত বেশি ভালোবাসেন তাদেরকে বিপদ দি ততবেশি পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষাতে পাস হলিই তো কাল কেয়ামতের দিন জান্নাত পাক্কা। সুরা নাবা'য় আল্লাহ বলিছেন, 'সাবধানীদের জন্যি রয়িছে সাফল্য, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র।' এসব পাওয়া কি এতই সুজা? দুনিয়ার যেত সুখশান্তি তো কাফের মুশরিকদের জন্যি। আল্লাহ আমাদের ভালোবাসেন বুলিই না এত পরীক্ষা— সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ।"

'আলহামদুলল্লিহা'— সবার সাথে সাথে চোখ মুছতে মুছতে বৃদ্ধও বললেন।

নামাজ শেষ করে মসজিদের এক পাশে মজিদকে ডেকে নিয়ে যান হুজুর। ফিসফিস করে বলেন, 'আমার প্রস্তাবটা ভেবি দেখো মজিদ মিয়া। এই দুর্যোগের মাঝে তুমার পরিবারের একখান গতি হইবে।'

মজিদ কোনো কথা বলে না। গোরস্থানের দিকে পা বাড়ায় সে। গেল বছর অনাবৃষ্টিতে মা মরছে, এইবার অতিবৃষ্টিতে ছেলেটা গেল। আশ্রয় আর হালের গরুটা ভেসে গেল গাঙে; এখন মেয়েটার জীবনটাও...! গ্রামে এত বড় ক্ষতি আর কারও হয়নি। মজিদ হাঁটতে হাঁটতে থামে। পিছন ফিরে তাকায় সে। জলের মাঝখানে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ধবধবে সাদা মসজিদটা।

'আল্লাহ, তুমি আমাকে এত ভালোবাসো? এত পরীক্ষা?' মজিদ আবার হাঁটতে শুরু করে। পানির ভেতর কাঁপতে থাকে মসজিদটা।

❖❖❖